

আমাদের নেতাজী

আমাদের নেতাজী

আর, মজুমদার, এম, কম।

তড়িৎ প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বি, মজুমদার
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুদ্রণে ঃ
শ্রীমা প্রেস, নবদ্বীপ।

সূচীপত্র

আমাদের নেতাজী

—:*:—

—উন্মেষ—

"দেশাত্মবোধ লাভ করতে হ'লে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি, শৃঙ্খলা ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাতে তরুণ সমাজ লাভ করতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হ'তেই চাই সাধনা।"

—সুভাষচন্দ্র

বহু পুরাণো আমাদের এদেশ। মানুষের সৃষ্টির পর কবে, কেমন ক'রে ঘটেছিল আমাদের এদেশের সৃষ্টি এবং আমাদের এদেশ মানুষের বাসের উপযুক্ত, তা' ঠিক করা বড় কঠিন। বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, গাছের কোটরে কোটরে থাকত, পাহাড়ের গুহায় গুহায় রাত কাটাত, হাড় দিয়ে, চক্‌মকি পাথরের টুকরো দিয়ে অস্ত্র গড়ত, ফলমূল খেত, পশুপাখীর কাঁচা মাংস খেত—সে ছিল মানুষের একদিন—

বুঝি তারপর বংশ বেড়ে গেল। থাকার জায়গা চাই বেশী।

আর্য্য বা সভ্য নাম নিয়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। ফরাসী, ইংরেজ, পারসিকাদি শীতের দেশের লোকেরা হলেন পরিশ্রমী, গৌরবর্ণ; গরমের দেশের লোকেরা হ'লেন একটু অলস, বর্ণ হ'ল মলিন আর নানা রকমের।

কালে কালে—তাঁদের ভাষায়, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে হ'ল কতই না ভেদ! একজনকে অন্যজনের চেনাই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল।

আগে যারা ছিল সেই আদিমবাসীদের সঙ্গে হ'ল অনেক মারামারি, কাটাকাটি। এরা সব অনার্য্য। অনার্য্যেরা আর্য্যদের কাছে একে একে কাবু হয়ে পড়ল।

ক্রমে আর্য্যেরা মহা মহা পণ্ডিত হলেন। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, তাঁরা কত কি রচনা করলেন।

কাজের ভাগ হ'ল তাঁদের—নাম হ'ল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এক এক বর্ণের এক এক কর্ম্ম।

যদু, পঞ্চাল, কুরু, বৈশালী, মগধ প্রভৃতি কত রাজত্বের সৃষ্টি হ'ল।

হিন্দুর দেশ—সারা দেশে কেবলই হিন্দু। ধন, রত্ন কিছুই বাইরে যায় না। বৈশ্যেরা ব্যবসায় ক'রে দেশের সম্পদ দিন দিন বাড়াতে লাগলেন। শাসন করেন ক্ষত্রিয়েরা, ব্রাহ্মণেরা দেন সুমতি, সুমন্ত্রণা। শূদ্রেরা সকলের সেবার সব কাজ ক'রে দেয়। সে ছিল একদিন!

গ্রীস দেশের লোভী রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার হিন্দু রাজা পুরুকে আক্রমণ করলেন। গোলযোগ আরম্ভ হ'ল।

অনেক কিছুর পর অশোক রাজা হলেন। সে কি সুন্দর রাজত্ব! ভাবলে এখনও কতই না আনন্দ হয়!

তারপর—চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজা হলেন। তারপর বাংলা দেশ গড়ে উঠল—

আদিশূর রাজা হ'লেন—ক্রমে পালবংশের লোকেরা পরে সেনবংশের লোকেরা—

মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন যখন ভারতবর্ষের মহারাজাধিরাজ তখন আরবে হজরত মোহম্মদের আবির্ভাব ঘটল ; এঁরই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম হ'ল ইসলাম। শিষ্যদের নাম হ'ল মোসলমান ; একশ' বছরের মধ্যে তাঁরা বহু দেশ জয় করলেন। বহু লোককেও মোসলমান করলেন। হেজাজ ও দাহির দু'জনের যুদ্ধ হ'ল! তারপর—তুর্কী মাহ্‌মুদ গজনবী—আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, রাজা জয়পাল—এমন ক'রে এল ১০০১ খৃষ্টাব্দ—

গজনীর লোভী মাহ্‌মুদ হিন্দুর মহা ঐশ্বর্য্যে-ভরা সোমনাথ অনেক বার লুঠ করলেন। মাহমুদ মারা গেলেন। তাঁর রাজ্যের পশ্চিমের ঘোরের বাদশাহ গিয়াসউদ্দীনের ভাই সাহাব্‌উদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করলেন।

হিন্দুরা তখন একতাহীন। ছোট ছোট রাজ্যে ভারত বিভক্ত, হিংসা খুব চলছে।

পাঠানেরা এসে ক্রমে সব কেড়ে নিলেন।

জালালউদ্দীন খিলজী, আলাউদ্দীন খিলজী এলেন। আরও এলেন তুগলকেরা।

তারপর—মহাদুঃসাহসী, দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ। যেমন সাহসী ও বিক্রমী, তেমনই নিষ্ঠুর। এই তৈমুর কিন্তু ছিলেন পঙ্গু—তবু তাঁর এত তেজ!

সৈয়দ, লোদী প্রভৃতি পাঠানদের পর এলেন মোগলেরা। তৈমুরের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বাবর ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মারা গেলেন ; তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন মোগলবংশ।

ক্রমে এলেন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"রূপে আকবর বাদশাহ। তাঁর পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সলিম হলেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ, নুরজাহান হলেন তাঁর বেগম। ইতিহাস-ভরা তাঁদের কীর্ত্তি।

তারপর এল ১৬১২ খৃষ্টাব্দ, বাদশাহ তখন জাহাঙ্গীর। সুরাটে দিলেন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কুঠি-নির্ম্মাণের অধিকার। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে এলেন স্যার টমাস রো, ইংরেজের দূত হ'য়ে জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারে।

খানিকটা ছেড়ে দিয়ে, চল যাই আমরা হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণকের কথায়।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের আমলের কথা। বছরে মোটে তিন হাজার টাকা দিয়ে ইংরেজেরা বাংলায় বাণিজ্যের অধিকার পেলেন—১৬৯০ খৃষ্টাব্দে।

জব চার্ণক সাহেব হুগলীর কুঠির কর্ত্তা—

হুগলীতে কুঠি না ক'রে তিনি তার ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে সুতানুটিতে করলেন কুঠি নির্ম্মাণ।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে শোভাসিং বিদ্রোহী হ'ল।

ইউরোপীয় এই ধুরন্ধর বণিকেরা চাইলেন আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ-নির্ম্মাণের অনুমতি। আর বাংলার সুবাদার দুর্ব্বল কাসেম খাঁ দুর্গ-নির্মাণের অনুমতি দিলেন—ইংরেজদের দুর্গের

হ'ল সূত্রপাত। ইংরেজের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে এই দুর্গের নাম হ'ল "ফোর্ট উইলিয়াম্"।

তারপর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পৌত্র, বাংলার সুবাদার আজিম উসশান ইংরেজদের কাছে—সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা—এই তিনটি গ্রাম বিক্রয় করলেন।

দাম, কড়ি ও আসরফির সেদিনে ব্যবসায় উঠল ইংরেজদের জেঁকে। আনতেন জীরের বদলে হীরে এতদিন আমাদের দেশের বেণেরা—এবার বিদেশী বণিকেরা উলটো চালাল সব-কিছু।

সত্যি, ভারতের এক অশুভ মুহূর্ত্ত এসেছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর। এই দিনে ২১৮ দু'শ আঠারজন ইংরেজ একত্র হ'য়ে এক যৌথ কোম্পানী গড়ে, অনুমতি পেলেন ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে। এরই নাম 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'

এই "বণিকের মানদণ্ড পরে
দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখনকার লোকেরা দেশের লোকের আত্ম-কলহের ছিদ্রপথে বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রলোভনে প্রতিষ্ঠা করল ইংরেজ রাজত্ব।

—রবার্ট ক্লাইভ—

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীগিরি নিয়ে মাত্র ১৭ সতের বছর বয়সে রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজে আসেন। মসী ছেড়ে তিনি অসি ধরলেন। ইংরেজ সেনানায়ক লাবুরদনে যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন, তখন তিনি ইংরেজ সেনাদলে যোগ দেন, কৌশলে আর্কট জয় করেন।

অনেক কিছু করার পর—বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর সময় এল।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের ছেলে মীর্জ্জা মোহম্মদ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা নামে বাংলার নবাব হলেন। এ হচ্ছে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কথা। এক বছরও কাটল না বুঝি। অতি অল্পদিন নবাবী করতে না করতেই তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরই কয়েকজন লোভী কর্ম্মচারী ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর ভগিনীপতি মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাতে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে তাঁরা বিষম চক্রান্ত করলেন। ডেকে আনল কুমীর, নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হ'তে প্রায় তেইশ মাইল দূরে পলাশীর আমবাগানে নামমাত্র এক যুদ্ধ হ'ল। এ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুনের কথা। নবাব পালালেন বেগম লুৎফউন্নেসা ও মেয়ে জহুরাকে নিয়ে। তাঁদের পথে ধরা হ'ল।

তারপর নবাবকে হত্যা করা হ'ল—নতুন নবাব হলেন মীর জাফর—তাঁর পর মীর কাসিম—উদ্ভট, বিকট, পঙ্কিল সে ইতিহাস।

এদিকে ভেদবুদ্ধি খাটিয়ে ধীরে ধীরে বেগে ইংরেজ রাজ্য বিস্তার ক'রে বসল উত্তর ভারতে, দক্ষিণাপথে। প্রায় সারা ভারত করল করায়ত্ত।

বাংলায় যেমন মীর জাফর—দক্ষিণাপথেও তেমনই হায়দরাবাদের নিজাম ও রঘুনাথ।

ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন এমনই হয়। টিপু সুলতানের মৃত্যুর বদলে স্বাধীনতা-সঙ্কল্প গেল ভেঙ্গে। মারাঠীরাও হলেন বাঙ্গালীদের মত। সত্যি বলেছিলেন পাঞ্জাবের রণজিৎ —'সব্ লাল হো যায়গা'। সব জায়গা রক্তে লাল ক'রে ইংরেজ করলেন রাজ্য-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইংরেজের বাড়াবাড়ি অসহ্য হ'ল। দেশ হ'য়ে উঠল টলমল।

একশ' বছর যেতে না যেতেই অত্যাচারী ইংরেজের অধীনতা-পাশ হ'তে মুক্তিলাভের জন্য বেধে গেল সিপাহী বিদ্রোহ। টোটায় গোরু ও শূকরের চর্ব্বির জনরবে সে আগুন প্রবল হ'য়ে জ্বলে উঠল।

প্রধানতঃ একতাহীনতা ও উপযুক্ত নায়ক-হীনতায় এ বিদ্রোহে ভাগ্যবান্ ইংরেজ জয়ী হ'লেন ; কারণ ভাগ্যে ছিল তাঁদের আরও একশ' বছর রাজত্ব।

তখনকার সম্রাট্ বাহাদুর শাহকে বন্দী ক'রে ইংরেজ ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসন করলেন। আর তাঁর উত্তরাধিকারী

দু'ছেলেকে ও নাতিকে হড্‌সন্ সাহেব অমানুষিকভাবে হত্যা করলেন। বড় বড় বিদ্রোহী-নেতা তাঁতিয়া টোপী প্রমুখ অনেকে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। না হ'লে ভারতের ভাবী তরুণেরা কি ক'রে করবে আত্মোৎসর্গ! ঝাঁসীর রাণীও যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন মেয়েদের আদর্শেরই নিমিত্ত।

পঁচাত্তর জন ইংরেজের বদলে, ইংরেজ খুন করলেন এ বিদ্রোহে পাঁচ হাজার ভারতীয়কে, দিল্লীতে ছাব্বিশ হাজারকে। ইংরেজের ক্যাপ্টেন্ নীল এলাহাবাদ থেকে কানপুরের পথের দু'ধারে প্রতি গাছে গাছে এক-একটি ভারতীয়কে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিজিত ভারতের শাসন-ব্যবস্থা তুলে নিলেন কোম্পানীর হাত থেকে। শাসনভার ন্যস্ত হ'ল তখনকার রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে। গড়ে উঠল—ভারত-সচিব পদ বিলেতে। ভারতে রাণীর প্রতিনিধি গভর্ণর-জেনারেল হ'য়ে আসতে লাগলেন।

ইংরেজ শাসন সুরু হ'ল—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ঘোষিত হ'ল মহারাণীর ঘোষণা-পত্র।

অনেক কাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাণী ভিক্টোরিয়া অখণ্ড প্রতাপে চালালেন তাঁর রাজ্যশাসন একাদিক্রমে যাট বছর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ অবধি। ভারতের সে কি অদ্ভুত রাণী-ভক্তি!

ক্রমে বড়লাট হ'য়ে এলেন ক্যানিং সাহেব, এলগিন্ সাহেব,

লরেন্স সাহেব, মেয়ো, নর্থব্রুক্, লিটন, রিপন, ডাফরিন, ল্যান্সডাউন, দ্বিতীয় এলগিন্ সাহেব ১৮৫৮ হ'তে ১৮৯৯ অবধি। তারপর এসময়ে মহারাণীর প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এলেন লর্ড কার্জ্জন সাহেব। ১৮৯৯ হ'তে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি প্রতিনিধিত্ব করলেন। এত অল্প বয়সে এত কাজের লাট আর কেউ আসেননি। তিনি সব-কিছুর ওলট-পালট করলেন। বাহাদুর ছেলে বটে!

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেহত্যাগ করলেন, রাজা হলেন তাঁর বড়ছেলে সপ্তম এডওয়ার্ড। লর্ড কার্জ্জন সাহেব দিল্লীতে বিরাট দরবার ক'রে মহাড়ম্বরে তাঁর রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করলেন। পরের ধনে পোদ্দারীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হ'ল।

দেশে এমন ছোট-বড় কোনও কাজ ছিল না যাতে এই ক্ষুদে লাটসাহেবটি হাত না দিয়েছিলেন। ভেঙ্গে গড়ে তিনি এক হুলুস্থুল স্থরু করে দিলেন।

অবশেষে যখন ভাবলেন, 'সবই তো করলেম, কিন্তু বাঙ্গালীদের যে ভাব দেখা যাচ্ছে এভাবে তারা তো ইংরেজকে রাজত্বই বুঝি করতে দেবে না। করি তাদের একতার মূলে কুঠারাঘাত—যাক্ বাঙ্গালী রসাতলে।' তিনি বঙ্গ-বিভাগ করলেন, অতি কুটিল তাঁর এ চিন্তা। মর্ম্মান্তিক আঘাত দিতে তিনি উদ্যত হলেন।

কিন্তু বিধাতা হাসলেন। এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে দেশে যে আগুন জ্বলে উঠল, তাতেই ইংরেজকে আজ দেশ

ছেড়ে যেতে হয়েছে। বিপরীত ফল ফলল—যদিও দেরী হ'ল অনেক।

স্বায়ত্ত-শাসনের সূচনা ও জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছিল প্রকৃত প্রস্তাবে কার্জ্জনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী লাট লর্ড রিপনের আমলে ১৮৮০ হতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের সুধীবর্গ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন স্বায়ত্ত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। সংখ্যায় অবশ্য তাঁরা ছিলেন অল্প কিন্তু তাঁদের শক্তি ছিল অসামান্য। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাম-গোপাল ঘোষ, হরিশ মুখার্জ্জী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী প্রমুখ মহাজনগণ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজ-নীতিক্ষেত্রে নবশক্তি জেগে উঠেছিল। ভারতের জাতীয় মহা সম্মেলনী—কংগ্রেসের উদ্বোধন হল বোম্বাই মহানগরীতে। সর্বপ্রথম সভাপতি পদে বৃত হলেন বাঙ্গালী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কংগ্রেসের নেতারা তখনই জানিয়েছিলেন দেশের লোকের অভাবের কথা ও আত্ম-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হ'বার দাবী! উচ্চ-নীচ সর্ব্বত্র জ্বলল হু-হু করে এ আগুন—

লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর শাসনের সুবিধার অজুহাত দেখালেও দেশবাসীর বুঝতে বাকী রইল না ইংরেজের মতলব।

দেশের দুই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বিরোধের কূটবুদ্ধি তাঁরা ঢুকালেন।

এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হতেই ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এই নবযুগের আরম্ভ হল, যদিও এ ব্যবচ্ছেদ পরে উঠিয়ে

দেওয়া হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার করে। আগুন চাচ্ছিল ইন্ধন। তাও গেল জুটে।

এ আগুনে ইন্ধন দান করলেন সুরেন্দ্রনাথ, গোখেল, তিলক, আনন্দমোহন, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি মনীষিগণ যাঁর যেমন শক্তি তেমন। জাতীয়তাবাদীরা করলেন বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন। বেণেজাতের রুটি বন্ধের কি চেষ্টা!

ভারতবর্ষের সৌভাগ্যক্রমে বহু মনীষীর যুগপৎ আবির্ভাব ঘটল ঠিক এর কিছু আগে ও ঠিক এ-ই সময়ে।

রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সংস্কার, সংবাদপত্র-প্রকাশ, ধর্ম্ম-প্রচার, নাট্যাভিনয়, সভা-সমিতি চলছিল জোর।

মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁর সমসাময়িক রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বঙ্গমহর্ষি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি নবীনচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দজীর আবির্ভাব ঘটল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল নবগোপাল মিত্রাদি মহাপুরুষদের চেষ্টায় 'হিন্দু মেলা'—

স্বাধীনতার স্বপ্নে দেশ হয়ে উঠল পুলকিত, মহাকবি হেমচন্দ্রের "শিঙ্গা" সত্যি উঠল বেজে। জেগে উঠল যত ঘুমন্ত ভারতবাসী।

ধর্ম্মের কুসংস্কার ধুয়ে মুছে ফেলে, ধর্ম্মের ভেতর থেকে দেশের সবাইকে জাগিয়ে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দজী। অসাধারণ

তাঁর কথা, অসাধারণ তাঁর কাজ, তিনি উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" বাণীর বাংলা করে বললেন বাঙ্গালীকে।

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন কংগ্রেসকে ধিক্কার দিয়ে—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নত শির।"

তবু সেই খোসামুদে কংগ্রেসেরই অধিবেশন চলল বছরের পর বছর, একের পর এক। বিদেশী ভাবে ভরপূর সে সব, যাকে বলে "ধামা-ধরা।"

ইতোমধ্যে নানাভাবের অনেক লাট এলেন ও গেলেন—কত পরিবর্ত্তনও হল।

মিণ্টো, হার্ডিঞ্জ, চেমস্‌ফোর্ড, রেডিং, লিটন, আরউইন, উইলিংডন, লর্ড লিন্‌লিথগোর আগমন ও প্রস্থান ঘটল, ১৯০৫ হতে ১৯৩৬ অবধি। সে অনেক কথা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ এল ধীর পদবিক্ষেপে। ১৮৮৫ হতে এই ১৯২১ খৃষ্টাব্দ অবধি কংগ্রেস অনেক কিছুর জন্য চেষ্টা করেও সত্যিকার কিছু করতে পারল না। ইংরেজ বলেন এক, করেন আর। সুবিধাবাদী তাঁরা, সাম্রাজ্যবাদী তাঁরা, লোভের তাঁদের নেই শেষ। তখন দক্ষিণ আফ্রিকা হতে এসেছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজী, সেদেশে নানা অপূর্ব্ব কাণ্ড করে জয়ী হয়ে। নিয়তি হাসলেন আবার।

দেশে এসে তিনি যোগ দিলেন কংগ্রেসে। উলটে গেল—আবেদন আর নিবেদনের পালা। নূতনে ভরা তাঁর অভিযান। চেষ্টা নতুন, কথা নতুন, অহিংস অসহযোগ তাঁর এক বিচিত্র নতুন মন্ত্র।

তিনি বহালেন সেই অহিংস অসহযোগের জোয়ার। বাংলার দধীচি চিত্তরঞ্জন যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। আজ হ'তে আটাশ বছর আগেকার সে-সব ঘটনা। ঘটনার পর ঘটনার চলল ঘাত-প্রতিঘাত। কাল-নেমি আবর্ত্তিত হ'তে লাগল ভারত-ভাগ্যে।

যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি তখন ইংল্যাণ্ডে। সব সংবাদ নিচ্ছেন—মুক্তির জন্য উন্মাদ হ'চ্ছেন। দেহ বিলাতে, মন এদেশে। ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষসিংহ—দিব্য তাঁর দৃষ্টি, দিব্য তাঁর মূর্ত্তি, দেবতুল্য তাঁর সব-কিছু।

বিলাত ছেড়ে—জাহাজ থেকে দেশের মাটিতে নেমেই—তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজী তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে অবাক্‌বিস্ময়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বাঙ্গালী-প্রধান চিত্তরঞ্জনের কাছে। ভাবলেন বুঝি, এমন ছেলেও আছে এ অভাগা দেশে! তা'হ'লে আর ভাবনা কি!

বিবেকানন্দ-পরমহংসের সম্মেলন হয়েছিল আধ্যাত্মিক। এ হ'ল রাজনৈতিক সম্মেলন, চিত্তরঞ্জন আর সুভাষচন্দ্রের।

যিনি বিলাতের মহাসম্মানের সিভিল্ সার্ভিস্ ছেড়ে দেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন, তিনি সেদিন বুঝি বিশ্ব-কবীন্দ্রের সেই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন তখন—

"* * * যাত্রা হ'ল সুরু * * *
তোমারে করি নমস্কার।
* * * বাতাস ছুটুক্, তুফান উঠুক্, ফিরবো নাকো আর
তোমারে করি নমস্কার।

প্রথম অধ্যায়
পরিবেশ

"যে চিন্তাশীল, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, শুধু সেই ব্যক্তি বাহ্য ঘটনা-পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীরূপা আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে।"—হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু তুমি কোথায়? তুমি কোথায় নেতাজী? তুমি জীবিত কি মৃত?

জাপানী নিউজ এজেন্সী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট ঘোষণা করলেন, সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক তিরোভাব-সংবাদ! সেই দিন হ'তে আজ অবধি সকলের নিকটেই তিনি রহস্যাবৃত, কি সে প্রহেলিকা! তার হ'ল না কোন সু-সমাধান—আজ কোথায় ভারতের নেতাজী?

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অনুরূপ এক জনরব শুনা গিয়েছিল। "স্বাধীন-ভারত-কংগ্রেসে" যোগ দিতে টোকিও-র পথে সুভাষচন্দ্র বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন, এমনই ছিল সে দুঃসংবাদ।

জাতির জনক গান্ধীজী এ দুঃসংবাদে ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সুভাষচন্দ্রকে আবার পাওয়া গিয়েছিল। সে দুঃসংবাদ সৌভাগ্যক্রমে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।

জাপ সরকারের সহিত নানা আলোচনার নিমিত্ত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক ১৬ই আগষ্ট বিমানে সিঙ্গাপুর হ'য়ে টোকিও যাত্রা করেন। ১৮ই আগষ্ট বেলা ২টার সময় তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে তাঁর সেই বিমান-দুর্ঘটনা হয়।

জাপানী হাসপাতালে মধ্যরাত্রে তিনি অন্তর্হিত হন। সঙ্গে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুনামাসা। তিনিও মারা যান —বেঁচে উঠেন কেবল সুভাষচন্দ্রের এড্‌জুটাণ্ট কর্ণেল হবিবর রহমান আর অপর চারজন জাপানী অফিসার।

কিন্তু কেহ বিশ্বাস করছেন না তাঁর এ মৃত্যুর সংবাদ! গতবারের জনশ্রুতির মত এবারকার এ দুঃসংবাদও মিথ্যা প্রমাণিত হোক্, এই আশায় দেশ আছে উন্মুখ হ'য়ে। তিনি আত্ম-গোপন ক'রে আছেন—লুকিয়ে আছেন, এ কথা কি সত্য হ'বে না?

জ্যোতিষীরা বলেন—তাঁর মৃত্যু, অসম্ভব; কিন্তু এ বেদনা যে আর সহ্য হয় না—তিনি কোথায়?

আশা ও নিরাশার এ কি তুমুল দ্বন্দ্ব! দেশবাসী যে আজ বিভ্রান্ত—দেশবাসী যে আজ ম্রিয়মাণ—কোথায় তুমি নেতাজী? তোমার সাধের দিল্লী জয় তো আজ যেমন তেমন ক'রে হয়েছে, তুমি কোথায়?

এসো তুমি—বল আবার সেই মধুর কণ্ঠে—"জয় হিন্দ্— দিল্লী চলো।"

তোমার দিল্লী-অভিযানের বাণীতে—তোমার কণ্ঠ-উচ্চারিত সেই তপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গারের মত ভীষণ বাণীতে আজ উদ্ধত বৃটিশ তাদের এত সাধের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছে।

আজ দেশ সারাপ্রাণে তোমায় চায়। তোমার সে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, তোমার সে দূরদর্শী নেতৃত্ব ভিন্ন দেশ যে আজ

কর্ণধারহীন তরণীর মত—কিন্তু তুমি কোথায়—জেনেও কি জানছ না—শুনেও কি শুনছ না? তোমার বাঙ্গালীরা যে আজ বাস্তুহারা, সর্ব্বস্বহারা, অসম্মান-ভয়ে সন্ত্রস্ত!

কি হয়েছে তোমার নেতাজী? তুমি যে আজ এই চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে পৃথিবীর অপরাপর সমৃদ্ধ জাতির ন্যায় সমৃদ্ধ—শিক্ষায় ও সম্মানে উন্নত ক'রে তুলবে!

সেই ১৯৪৬ হতে এই ১৯৪৯ অবধি সুদীর্ঘ চার বছর মহা-আড়ম্বরে তোমার জন্ম-বার্ষিকী করছি আমরা—এসে আমাদের পরিত্রাণ কর। কত অসম্ভবও তো সম্ভব হয়—হে ভারতের ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত্ত প্রতীক—হে যুগাধিনেতা, পুনরাবির্ভাবে অখণ্ড ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরবাসন অচিরে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

তোমার আগমনের কি অন্তরায়?

চিন্তা করলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝি—সে সহজ নয়—তাই তুমি করে রয়েছ এ আত্ম-গোপন।

তোমার কোষ্ঠী বলছে, তোমার আট বছর প্রবাস এ সময়ে। দেশ ছেড়েছ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে—এই তো আট বছর পূর্ণ হচ্ছে—এবার তো তুমি না এসে পার না—সময় যে মার্চ্চ হতে আগষ্টের মধ্যে—

কি ভাবব বল?

ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, মহাত্মাজীও তোমার মতই "ভারত ছাড়" প্রস্তাব করেছিলেন যুদ্ধ না করে—আজ তুমি শত্রু-মিত্র বহুর হৃদয় অধিকার করেছ। সকলে ঘিরে থাকলেও কি তোমার জীবন-রক্ষা সম্ভব হবে না? সকলে

তো তোমায় ঘিরবে না—বিশ্বাসঘাতকের এদেশ—শেষে যদি তোমার বাপুজীর দশা ঘটে!

ভারত আজ তথাকথিতভাবে স্বাধীন হয়েছে, সে স্বাধীনতায় বাঙ্গালীর কি? তুমিও বাঙ্গালী, তোমারই বা কি?

অবান্তর কথা—টোকিও-র "ওয়ার ক্রাইম্স্ ট্রাইবুনাল"ও তো শেষ হয়েছে, তোজোর তো ফাঁসি হয়ে গেছে, সে ট্রাইবুনাল তো আর নেই। তবু আসছ না কেন?

বৃটিশ এবং আমেরিকান সরকার তোমার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁরা জানেন, তুমিই তাঁদের মর্মের কথা জান—তুমি জান তাঁরা ভারতের শোষক, ভারতের তাঁরা ঘোর শত্রু, ভারতের তাঁরা কোন ভাল দেখতে পারেন না। তাঁরা আজও সমভাবে ভারতের যত কিছু বড় বড় সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অধিকার করে রেখেছেন; কয়লার খনি, জাহাজী কারবার, বৈদ্যুতিক কোম্পানী, গ্যাস ও ট্রাম কোম্পানী, রবারের বাগান, কাপড়ের কত কল, পাটের কত কল তাঁদের কুক্ষিগত। কম-বেশী তাঁরা দু'হাজার কোটি টাকা নিয়োজিত রেখেছেন এদেশে—অবাধে শোষণ করছেন প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা—তুমি যদি ফিরে এসো—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেবে তোমার হাতে, দেবেও বোধ হয় সবাই তোমার হাতে—তুমি যে ধরনের মানুষ—তুমি ওদের সব ব্যবসায়—সব চতুরতা জোর ক'রে বাজেয়াপ্ত ক'রে বস্‌বে। ওদের অবৈধ শোষণ হ'তে ভারতকে মুক্ত করবে। এ সব জেনে ওরা তোমাকে এদেশে টিক্‌তে দেবে না নিশ্চয়—

ওদের দলবল পাশবিকতায় পরিপূর্ণ—এমন কাজ নেই যা তারা স্বার্থের জন্য না করতে পারে—চিরদিনই ক'রে এসেছে, বহু বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে তো। নেহেরু সরকারের প্রহরী,—সশস্ত্র প্রহরী-যোগে বিমানে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের কোনটাই তো তোমার জীবন-রক্ষার নিশ্চিত রক্ষা-কবচ নয়।

কিন্তু গ্রহগণের পরম শুভ সন্ধিক্ষণে তো তোমার জন্ম, কত ভাবনাই তো মনে আসে আবার ডুবে যায়—

তোমার মৃতদেহ—তোমার অনুচরগণকে দেওয়া হ'ল না কেন? বৃটিশ কোন স্থানীয় সেনানায়কের হাতে দিলেন না কেন? মৃত্যু অবধারিত জেনেও তোমার বিরুদ্ধে মামলা মুলতুবী কেন?

তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বলেছিলেন, তোমার অন্তর্দ্ধান সময়ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটের সময় তিনি তোমাকে মোটরে ২১০ মাইল দূরে গোমোয় নিয়ে যান—১৮ই জানুয়ারী ওঠো তুমি উত্তর-ভারত-গামী এক ট্রেণে, বলো তুমি যাবার সময় ভাইপোকে—"আমি চললাম, তুমি ফিরে যাও।"

এ-যে বুদ্ধের গৃহত্যাগকালে তাঁর রথের সারথি ছন্দকের সহিত কথোপকথনের মত।

উত্তমচাঁদ বলেছেন, "মৌলবীর ছদ্মবেশে যাও তুমি বর্দ্ধমান, পাঞ্জাব মেলে পেশোয়ার যাত্রা কর—১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় পৌঁছ পেশোয়ারে," কিন্তু মনে হয় উত্তমচাঁদেরও এ উপন্যাস—সব তার সত্য নয়।

অন্তর্দ্ধান তোমার যেমন রহস্যাবৃত—তিরোধানও তাই। হবিবর রহমান সাহেবের পূর্ব্বাপর দু'টি বিবৃতি স্ব-বিরোধ-দোষে দুষ্ট—সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশেরের বিবরণের সঙ্গে নেই সামঞ্জস্য—ফরওয়ার্ড ব্লকের মুকুন্দলাল সরকারের মার্সাই বিমানঘাঁটিতে তোমার দর্শনও প্রমাণহীন। বৃটিশ সরকারের সর্ব্বজ্ঞকল্প সুনিপুণ চর-গোষ্ঠী স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-মণ্ডলীর অনুসন্ধান তুমি কি ব্যর্থ করেছ? তোমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট প্রমাণাভাবে সম্পূর্ণ অর্থহীন। মৃত্যুর ফটো তুলল না কেন ফটোগ্রাফার, কোথায় গেল তোমার পরিচ্ছদ? অন্তিম-কার্য্যের সময় কোন ভারতীয় রইলেন না কেন?

তুমি যেভাবে অন্তর্দ্ধান করেছিলে—আজও সে-সব সুস্পষ্ট মনে পড়ে।

সে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস, এলগিন্ রোডের বাড়ীর যে ঘরে তুমি শুতে, সে ঘরের পাশের ঘরের দরজায় একখানা পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে রাখতে। ঘরের ভিতরে কারও ছিল না প্রবেশাধিকার। ফলমূল খেতে, বগলামুখী মন্ত্র জপ করতে। মঙ্গল গ্রহের ইষ্টদেবতা এই বগলা দেবী। সিদ্ধির জন্য এই অব্যর্থ মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা তন্ত্রে আছে।

নিরুদ্দেশের সংবাদ রাষ্ট্র হ'ল—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী। কিছুদিন আগেই তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে তোমার বাড়ী।

—সে হ'চ্ছে ১৩৪৭ সালের ২৯শে পৌষের কথা—তোমার মা বলেছেন:—

"সুভাষ ত কাল থেকে দিন পনের ব্রত নেবে ঠিক করেছে —কারুর সঙ্গে দেখা করবে না—এমন কি আমারও ঘরে ঢোকা বারণ। মৌন ব্রত,—দুধ ফল যা খাবে তাও দরজার বাইরে রেখে দিতে হ'বে, ঘরে ঢুকে দেওয়া চলবে না।

বিশ্রাম হ'বে না এতে কিন্তু--ঘরের মেঝেতে বাঘছাল বিছানো হয়েছে, গীতা-চণ্ডী ক'দিন খুব পড়া হ'চ্ছে—বিশ্রাম কোথা ?"

কি কঠোর এ বীর-ব্রত তোমার ? জননীকে পর্য্যন্ত ইঙ্গিত দাওনি তুমি—এতই তোমার আত্মগুপ্তির শক্তি ! চির-গৃহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পরমারাধ্যা জননীর চরণ-বন্দনার প্রলোভনও তুমি জয় করেছিলে--এত-ই প্রিয় তোমার দেশ —এত-ই প্রিয় তোমার দেশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়াস ! কি দৃঢ়চিত্ত তুমি !

সদ্য কারামুক্ত তুমি—তবু রাজরোষ জ্বালাচ্ছে তোমায়, ক'নম্বর মামলা তোমার মাথার উপর ঝুলছে—তুমি রাজদ্রোহী —তুমি স্বগৃহে নজর-বন্দী—তোমার জন্য রাস্তার উপর বৃটিশের কড়া পাহারা !

তোমার তিরোধান, তোমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কথা ভেবে ভেবে দেশবাসী সারা হচ্ছেন—যদি বেঁচে থাকো, আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে। রক্তমাংসের শরীর আমাদের, রক্তমাংসের শরীরেই দেখতে চাই তোমাকে—অন্য কিছুতেই মন প্রবোধ মানে না। কিন্তু তোমার সে-শরীরও তো অবশ্যই নশ্বর। সে-শরীরের বিনাশ তো একদিন হ'বেই হ'বে।

অবিনশ্বর শাশ্বত তোমার পরবর্ত্তী শরীর ; সুভাষিত থাকবে সেই শরীরে নেতাজী, তোমার নাম চিরকাল।

ইংরেজ বুঝেছিল, যে ভারতে তোমার মত মানুষ আছে সে ভারতকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হ'বে না—তাই না তারা ভারত ছেড়েছে।

তুমি শিখিয়েছ—আমরা দুর্ব্বল নই—বলহীন নই। ইচ্ছা-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করলেই সব কিছুই সম্ভব। তোমার জীবন তার পরিপূর্ণ আদর্শ।

তুমি নেতা, আমাদের দেশের নেতা, মনের নেতা, আমাদের শক্তির নেতা—তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছ, দেশের স্বাধীনতা যে হরণ করবে, তাকে সহজে ছাড়বে না, তাকে দেবে না প্রশ্রয়। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করতে পারে না। যে বল, যে শক্তি থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায়, সুভাষচন্দ্র সেই শক্তির সন্ধান আমাদিগকে দেখিয়েছেন। কারাগারেও তুমি একদিন শক্তির পূজা করে-ছিলে। সেই দেবীই তোমার মধ্যে শক্তিরূপে কার্য্য করছেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পাবনায় তুমি বলেছিলে, "প্রভাত সূর্য্যোদয়ে যেমন সুদীর্ঘ রজনীর তমসাবৃত মেঘমালা দূরে পলায়ন করে, তেমনি আমরা শীঘ্রই দেখব যে, যুগ-যুগান্তব্যাপী পরাধীনতা প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মত অন্তর্হিত হবে এবং স্বাধীনতা-সূর্য্য জাতির ললাটে গৌরবময় বিজয়টীকা পরিয়ে দেবে।"

স্বাধীনতা ছিল তোমার হৃদয়ের শোণিত—স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে তুমি তো কোনদিন, কিছুই ভাবতে পারনি।

আরাকানকে তুমি পলাশীতে পরিণত করেছিলে। তুমি এ-যুগে বুদ্ধের মত বৈরাগী, শিবাজীর মত সাহসী, রণজিতের মত রণনিপুণ, প্রতাপের মত পরাক্রান্ত, নানা সাহেবের মত অকরুণ, নাদির শাহের মত নির্মম, নেপোলিয়ানের মত নির্ভীক, শ্রীঅরবিন্দের মত সু-শিক্ষিত, ক্ষাত্র-অবতার বিবেকানন্দজীর মত বীর্য্যবান, সেকেন্দার শাহের মত সাগ্নিক, সারা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা. সারা বিশ্বের সাগ্নিক তাপস ছিলে তুমি, সিরাজের মত কি তুমি শহীদ হয়েছ? বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় ভারত-রক্ষা আইনের অভিযোগে তুমি ছিলে অন্তিমে অভিযুক্ত। তোমার ইংরেজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড ব্লক" পত্রিকায় তুমি লিখেছিলে এক প্রবন্ধ—"হিসাব-নিকাশের দিন"; সেজন্যও তুমি অভিযুক্ত হয়েছিলে।

মনে পড়ে, ৫ই ডিসেম্বর তুমি দক্ষিণ কলকাতায় তোমার বাড়ী এলগিন রোডে ফিরে এলে। বৃটিশ সরকার তোমায় যথেষ্ট সন্দেহ করতেন—সদা সতর্ক প্রহরীতে দিনরাত তোমার বাড়ীর সম্মুখ ও চতুর্দ্দিক ঘিরে রাখলেন। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী রাষ্ট্র হ'ল, অতি রহস্যজনকভাবে তুমি নিরুদ্দিষ্ট হ'য়েছ। তোমার বাড়ীর অংশ ক্রোক্ করলেন সরকার তোমাকে না ধরতে পেরে। ছয় মাস উপস্থিত হ'লে না, সরকার আইনমত নীলামে তুললেন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। কোন ক্রেতা এল না। আবার নীলামের দিন পড়ল—সে-দিনও এলো না কোন খরিদ্দার। কালেকটার পাঠালেন তোমার নথি কমিশনারের কাছে।

১৯৪১-এর কি সে ২৬শে জানুয়ারী! সেদিন যে "স্বাধীনতা দিবস"। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে গিয়ে দেখল—উৎকণ্ঠ হ'য়ে শুনল—সুভাষচন্দ্র তাঁর গৃহে নেই!

অসুস্থ ছিলে তুমি—কোথায় গেলে—কেমন ক'রে! সম্ভব অসম্ভব সকল স্থান অন্বেষণ করা হ'ল। বৃটিশের লোক ছুটে বের হ'ল—কর্ম্মতৎপরতা দেখাতে লাগল। কেউ দিতে পারল না তোমার কোনই সংবাদ। দেশবাসীর সে কি ব্যাকুলতা! যদি ধরা পড়ো।

টেলিফোন ভিন্ন কথা কওয়া বন্ধ করেছিলে, কক্ষের বাইরের টেবিলে থাকত তোমার আহার্য্য! প্রয়োজনমত নিজে নিতে সে-সব তুমি। বহুদিন পর একদিন সহসা রেডিও বেজে উঠল, শোনা গেল তোমার সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি—

"দু'শ বছরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করেছি। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। * * * বৈদেশিক সর্ব্বপ্রকার সাহায্যই সাদরে বরণ করবো।"

পরাধীন দেশের পলাতক বন্দী তুমি—এ কি তোমার আকাঙ্ক্ষা—এ কি তোমার স্বপ্ন!

তোমার এ-স্বপ্ন সম্পর্কে তুমিই একদিন বলেছিলে—"ওরা বলে আমি স্বপনচারী। আমি স্বীকার করছি, আমি স্বপনচারীই বটে, সারাজীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি,…। কত স্বপ্নই না আমি দেখেছি! কিন্তু আমার স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন—জীবনের সব চাইতে প্রিয় স্বপ্ন—ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন।"

রেডিও বক্তৃতার আগে নও-জোয়ান ভারত-সভার সেক্রেটারী ভকৎরামের সঙ্গী হ'য়ে সুভাষ পেশোয়ারে ছিলেন। পোষাক ছিল তাঁর একটা অাঁটা পায়জামা, একটি শেরওয়ানী ও ফেজ টুপি। সে বেশ মৌলবীর। ১৯শে জানুয়ারী আফগানিস্তানে রওনা হ'লেন, পরলেন পাঠানের পরিচ্ছদ—সঙ্গীর নাম হ'ল রহমৎ খাঁ আর সুভাষচন্দ্রের নাম জিয়াউদ্দিন—তিনি সাজলেন বোবা, কালা, অসুস্থ।

এক কনেষ্টবলের হাতে প'ড়ে অনেক টাকা, এমন কি নিজের হাতের রিষ্ট ওয়াচটি পর্য্যন্ত ঘুষ দিতে হ'ল।

১৮ই মার্চ্চ ইটালী ও জার্ম্মানী এই দুই অক্ষ-শক্তির সাহায্যে পাশপোর্ট নিয়ে "ক্যারাটাইন্" নাম নিয়ে যাত্রা করলেন। ১৯শে প্রবেশ করলেন রাশিয়ায়। ২৮শে মার্চ্চ বার্লিনে উপনীত হ'লেন।

এ সময়ে হারছিলেন ইংরেজ বাহাদুর। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হ'তে তাঁরা সরে পড়তে বাধ্য হ'লেন; ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ নৌঘাঁটির অন্যতম কেন্দ্র সিঙ্গাপুরের পতন হ'ল।

ইংরেজ সৈন্য ভারতীয় সৈন্যদের ফেলে পালাল—ভারতীয় সৈন্য বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করল।

বৃটিশের পক্ষ হ'তে লেঃ কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদিগকে একদল ভেড়ার মত জাপানের হাতে ছেড়ে দিলেন।

জাপানের মেজর ফুজিয়ারা দিলেন তাঁদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের হাতে।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ছিলেন টোকিওতে ; তিনি এক সভা করলেন। সভায় প্রস্তাব হ'ল—পূর্ব্ব-এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ করবেন।

পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, সকল প্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য এ আন্দোলন চলবে।

স্বাধীন ভারত বাহিনী হ'বে এর কর্ত্তা—তার নাম "আজাদ হিন্দ ফৌজ।" প্রয়োজন হ'লে এঁরা জাপানের সাহায্য নেবেন।

ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। এ হ'চ্ছে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই হ'তে ২৩শে জুনের প্রতিনিধি-সম্মেলনের কথা। এর নাম ব্যাঙ্কক সম্মেলন। গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠল—আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু মহাশয়।

সিঙ্গাপুর হ'ল প্রধান কর্ম্মস্থল। পূর্ব্ব-এশিয়ার সর্ব্বত্র শাখা স্থাপিত হ'ল।

ভারতে এদিকে অহিংস আন্দোলন চালাতে চালাতে গান্ধীজী কংগ্রেস হ'তে ৮ই আগষ্ট "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ভারতময় ছড়িয়ে পড়ল—"করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে" মহামন্ত্র।

ভারতের বহুদিনের মন্ত্র এই—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—আবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'ল।

দাবানল জ্বলে বনে—গাছে গাছে ধরে যায় ভীষণ হ'তেও ভীষণতর আগুন। বনের পশু, পাখী, সরীসৃপের আর রক্ষা

থাকে না। কিন্তু এবার দাবানল জ্বলল—ভারতবর্ষের সমগ্র মানব-মণ্ডলীর মনের গহন বনে—সব-কিছু ছারখার করতে লাগল।

অস্থির হ'য়ে উঠলেন বৃটিশ শক্তিধরগণ। তাঁরা নেতাদের করলেন কারারুদ্ধ, অত্যাচারের উপর অত্যাচার চলল। গুলি চলল—বিমান হ'তে বোমা বর্ষণ ক'রে শত শত গ্রাম, শত শত নগর বিধ্বস্ত করা হ'ল।

সংবাদ গেল পূর্ব্ব-এশিয়ায়। আশ্চর্য্য চঞ্চলতা দেখা দিল। তাঁরাও প্রস্তুত হ'তে লাগলেন তাঁদের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য। ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং তাঁদের অধিনায়ক হলেন। সব দিক হ'তে সাহায্য সম্ভব হ'য়ে উঠল।

জাপান বিরোধী হলেন—অনেক গোলযোগ বেধে গেল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের সিঙ্গাপুর সম্মেলনে রাসবিহারী বসু মহাশয় প্রস্তাব করলেন, সুভাষচন্দ্র আসছেন—তাঁর উপর সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হোক্।

২০শে জুন হাসান নামক এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে জাপান উপস্থিত হলেন। ২রা জুলাই পৌঁছলেন সিঙ্গাপুরে—আর ৪ঠা জুলাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্রই নির্ব্বাচিত হলেন সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী।

৫ই জুলাই বিরাট জনসঙ্ঘকে সম্বোধন ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহীসালার, সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বললেন:—

"ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব্বের দিন। আজ ঈশ্বর আমাকে এই কথা ঘোষণা

করার অপূর্ব্ব সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সেনাদল গঠিত হয়েছে।

"হে আমার সহচর সেনাবৃন্দ! তোমাদের রণধ্বনি হোক আজ হ'তে—"দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।"

"প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হ'বে না। মনে রেখো যে, তোমাদের মধ্য থেকেই স্বাধীন ভারতের ভাবী সেনানায়কদল গড়ে উঠবে।

"আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বেশী গর্ব্বের দিনে একথা আমি বলছি। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় আর অন্য কিছুই নেই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে সমপরিমাণ দায়িত্ব রয়েছে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

"আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি—আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্ব্বদা তোমাদের পাশে পাশে থাকব। বর্ত্তমানে তোমাদের আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিতে অসমর্থ।"

এগিয়ে আসতে থাকল সকলেই, নারীরাও সভ্যা হ'তে লাগলেন। স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ ক'রে শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে "ঝাঁসীর রাণীবাহিনী" গড়ে তোলা হ'ল। নারীদের সুবৃহৎ সামরিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এ হচ্ছে

২২শে অক্টোবরের কথা, সিপাহী যুদ্ধের ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের ঐ দিন ছিল জন্মদিন।

সুভাষচন্দ্র এই বাহিনীর উদ্বোধনে বললেন :—"এ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয় এ দেশের পুনর্জ্জীবনের মহান্ কাজ, ভারতের জন্য আমরা এক নব যুগ আনছি, তার ভিত্তি সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হ'বে। এ ঢক্কা-নিনাদ নয়—আমি দেখছি ভারতের পুনর্জ্জন্ম আসন্ন, এ নব-জাগরণ নারীদের মধ্যেও স্বাভাবিক। ১৫৬ জন নারী এই শিক্ষা-শিবিরে শিখছেন, আশা করি শীঘ্র তাঁদের সংখ্যা হাজার হ'বে। ইতিমধ্যে থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মেও নারী-শিক্ষা শিবির স্থাপিত হয়েছে। সিঙ্গাপুর এর কেন্দ্রীয় শিবির। আমি বিশ্বাস করি, এই সব শিবিরে হাজার হাজার ঝান্সীর রাণী প্রস্তুত হ'বে!"

তারপর বাল-সেনাদল গঠিত হ'ল, আত্মঘাতী এ সৈনিক দল। ব্রহ্ম রণাঙ্গনে এই কিশোর-কিশোরীরা স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংসই ছিল এদের প্রধান কর্ম্ম। কি অদ্ভুত এই বালক-বালিকারা!

মৃত্যু অবধারিত জেনেও তারা নিজেদের পিঠে "মাইন" বেঁধে অকস্মাৎ বিপক্ষের ট্যাঙ্কের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ত। বিপক্ষের ট্যাঙ্কগুলি এদের পিঠের মাইনের ঘর্ষণে ধ্বংস হ'ত আর সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও দেহ হ'য়ে যেত চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন : "ভারতের নিজস্ব বাহিনীই ভারত উদ্ধার করবে। কোন বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব, কোন বৈদেশিক

সৈন্য ভারতে স্বীকৃত হ'বে না। আমাদের এ বাহিনী বিভীষণ বাহিনী ব'লে কুখ্যাত হ'বে না; জাপানীদের নীতির সঙ্গে এর কোন সংশ্রব থাকবে না, তা'হ'লে যে ইতিহাসে এ বাহিনী "পঞ্চম বাহিনী" ব'লে কলঙ্ক-ভাজন হ'বে।"

নব শক্তি জাগ্রত হ'ল। মালয়ে সামরিক শিক্ষা-কেন্দ্র গঠন করা হ'ল। এক একবারে শেখানো হ'তে লাগল সাত সাত হাজার ক'রে সৈন্যকে। অর্থ আসতে লাগল অকাতরে—এল তারপর গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের কল্পনা। অচিরাৎ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টও স্থাপিত হ'ল, নাম হ'ল তার—"স্বাধীন ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট"। সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক হলেন নিজে সুভাষচন্দ্র। বৃটিশের বিরোধী সব রাষ্ট্র একে স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মান দান করল।

ভারত চায় তার স্বাধীনতা—অধীন ক'রে রেখেছে তাকে বৃটিশ, তার বন্ধু আমেরিকা সহায়তা করছে তাকে; কাজেই স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না ক'রে পারে না। যুদ্ধ ক'রে ইংরেজকে পরাজয় করা যাবে না ব'লে যারা কাপুরুষের মত এতদিন নানা ভয়ের কথা বলত, সুভাষচন্দ্র তাদের ভয় ভেঙ্গে দিলেন। তারাও মানুষ, ভারতবাসীরাও মানুষ। তারা যুদ্ধ করতে জানে, ভারতবাসী কেন যুদ্ধ করতে জানবে না? ভারতে যারা থাকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নিয়ে, নানা অস্ত্র আইন ক'রে ইংরেজ তাদের ক'রে রেখেছিল অকর্ম্মণ্য, ভীরু—সুভাষচন্দ্র একাকী গড়ে তুললেন দুঃসাহসিক সৈন্য সব, কি আশ্চর্য্য তাঁর ক্ষমতা—ভাবলে স্তম্ভিত হ'তে হয়

—দেশে নয় বিদেশে এমন্ সংগঠন-শক্তির পরিচয় ইতিহাসে বড় দেখা যায় না।

প্রতাপসিংহ, শিবাজী প্রভৃতির সঙ্গে যাঁরা সুভাষচন্দ্রের তুলনা করেন, তাঁরা মস্ত বড় ভুল করেন—তাঁরা ছিলেন দেশে, রাজত্ব, যুদ্ধোপকরণ, সৈন্য—অনেক কিছু তাঁদের ছিল।

কিন্তু এ কী সুভাষচন্দ্র! কোন সহায়, কোন সম্পদ নিয়ে তিনি যাননি সেই সুদূর দেশে, অথচ নিজের প্রতিভায় তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার আয়োজন ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

ভারতের নিকটে ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মস্থল স্থাপিত হ'ল। সব কার্য্য চলতে লাগল নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে।

অবিলম্বে ১৯টি বিভাগ সৃষ্টি করা হ'ল। কাগজপত্র, হিসাব চলল যথাযথ। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ সব ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, প্রাণ দিয়ে সব কাজ করেন।

মালয়ে, ব্রহ্মদেশে শ্যামে, আন্দামানে, সুমাত্রায়, জাভায়, বোর্ণিওতে, সেলিবিসে, চীনে, মাঞ্চুকুয়ে ও জাপানে অসংখ্য শাখা—অভাবনীয় প্রভাব দেখা দিল।

সুভাষচন্দ্রের প্রভাব অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠল। সিঙ্গাপুরে চেট্টিয়ার মন্দিরের মত হিন্দুভাবাপন্ন মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ পরিয়ে দিলেন বিভূতি মোসলমান ও খ্রীষ্টান সবার ললাটে, সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে এ এক অত্যাশ্চর্য্য, অভাবনীয় ব্যাপার!

এত দ্রুত, এত সব কাজের, এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা একটি

বাঙ্গালীর ছেলে যে কি ক'রে সম্ভব ক'রে তুললেন ভাবলে সুভাষচন্দ্রের নিকট আপনা আপনিই মাথা নত হ'য়ে পড়ে।

ইংরেজীতে চলল না সৈনিকদের ট্রেনিং বা শিক্ষাদান। সব-কিছু হিন্দুস্থানীতে।

ভারতীয় অর্থে সব আয়োজন, উদ্যোগ চলল। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, রসদ সবই ভারতীয়। হাজার হাজার সৈনিকের পোষাক আসত কোথা হ'তে ভাবলেও চমৎকৃত হ'তে হয়।

ব্রহ্মদেশের ভারতীয়গণই দিলেন কিছুদিনের মধ্যে আট কোটি টাকা। নববর্ষের উপহারই দিয়েছিলেন মালয়বাসিগণ ভারতকে চল্লিশ লাখ টাকা।

শুধু কি যুদ্ধ! রাজ্য স্থাপন করলে, যা কিছু দরকার সব চলল। চিকিৎসালয়, ডাক্তার, ঔষধপত্র, পথ্য, খাদ্য, যুদ্ধ, পীড়িতদের সাহায্য, অসহায় নারী, শিশু ও দুর্গত জনের নানা সাহায্য!

জমি বের করে, নতুন বসতি-স্থাপনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই হয়েছিল দু'হাজার একর জমিতে—এক মালয়েই।

৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয়ই খোলা হয়েছিল, গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার উপযুক্ত লোকের হাতে অর্পিত হয়েছিল। সামরিক সঙ্গীত রচিত হ'য়ে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কুচ-কাওয়াজ চলল। সৈনিকেরা "জয় হিন্দ্" রবে গগন পবন মুখরিত করতে লাগল।

সে কি কোলাহল, সে কি আনন্দ, সে কি হর্ষ!

আজাদ হিন্দ্ সৈনিকের গান

কদম্ কদম্ বাড়ায়ে জা
খুসীকে গীত গায়ে জা
এ জিন্দগী হ্যায় কৌমকী
(তো) কোম্‌কৈ লুটায়ে জা ॥

তুঁ শেরে হিন্দ্ আগে বাঢ়
মরণে সে কিরভি তু ন ডর
আসমান তক্ উঠাকে শির
জো শে বতন্ বঢ়ায়ে জা ॥

তেরী হিম্মত বাঢ়তি রহে
খুদা তেরে শুনতো রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো থাক্‌মে মিলায়ে জা ॥

চলো দিল্লী ফুকারকে
কৌমী নিশান সামালকে
লাল কিল্লে পৈ গাড়কে
লহ্‌রায়ে জা লহ্‌রায়ে জা ॥

সঙ্গীতটির একটি বাংলা অনুবাদ :—

পায়ে পায়ে হও আগুয়ান।
কণ্ঠে বাজুক আনন্দ গান ॥
দেশের তরে জীবন প্রাণ।
দেশের তরে কররে দান ॥

হিন্দ্ বাঘ চলো, আগে যাই
মৃত্যুর ভয় আর কিছু নাই—
আকাশ ভেদী উঁচু করে শির—
দেশের শক্তি বাড়াও হে বীর ॥

বেড়ে যাক্ বুকের জোর—
খোদা আছেন সহায় তোর
রোখে তোকে সাহস কার ?
ধূলায় হ'বে কবর তার।
মুখে গাও—দিল্লী চলো
লাল কেল্লার মাথায় তোলো
উঁচু করি তব জাতীয় নিশান
লড়ায়ে হও—হও আগুয়ান।

ইংরেজদের তাড়িয়ে জাপানীরা চেয়েছিল ভারত গ্রাস করতে। মনে মনে তাদের ছিল এই কূট—কুটিল বুদ্ধি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র অনমনীয়, চতুরাধিক চতুর। তিনি নিজের দেশ আবার পরকে অধিকার করতে দেবেন কেন ? তাঁর বিক্রমে, তাঁর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে, লোভী জাপানকে তাদের ভারত-বিজয়ের লোভ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। জাপানীরা জয়ী হচ্ছিল বটে কিন্তু হকোয়াং উপত্যকায় বৃটিশের আক্রমণ এবং তাদের চিন্দুইন নদী অতিক্রমের আশঙ্কায় জাপানীরা অধীর—অস্থির হ'য়ে পড়ছিল।

তারা ব'লে ফেলল, তারা শুধু ইম্ফলই দখল করতে চায়, ভারত আক্রমণের সমস্ত কার্য্যকলাপ "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" চালাক্ ; এই ব'লে তারা সব ছেড়ে দিল।

এল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী—"আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" আক্রমণ চালাল—ক্রমে ১৮ই মার্চ্চ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতভূমিতে পদার্পণ করল সেই গৌরবদীপ্ত ফৌজ।

এ সময়ে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ :—

(১) সুভাষচন্দ্রের অতিপ্রিয় সেনাপতি শা' নওয়াজ বাষট্টি শ' জন সৈন্য নিয়ে "সুভাষ বিগ্রেড" গ'ড়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন।

(২) "গান্ধী ব্রিগ্রেড" পরিচালনা করলেন কর্ণেল ইনায়ৎ কয়ানী, এতে সৈন্য আটাশ শ' জন।

(৩) তারপর কর্ণেল মোহন সিং দু'নম্বর ব্রিগ্রেডের সমান সৈন্য নিয়ে "আজাদ ব্রিগ্রেড" গ'ড়ে যুদ্ধে চললেন।

এ ছাড়া কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলন নিয়ে চললেন তিন হাজার সৈনিক ; "নেহেরু ব্রিগ্রেড" তার নাম।

এ ছাড়া চলল—তিনশ' বাহাদুর দলের ফৌজ। সাতশ' বেসামরিক সাহায্যকারী।

যুদ্ধ ক'রে দখল করলেন—সোরাই, কোহিমা ও অন্যান্য অনেক স্থান। ফৌজ ইম্ফলে উপস্থিত হ'ল। নিয়তি আবার হাসলেন—ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হ'ল। যাতায়াত হ'ল দুর্ঘট। ইম্ফল আক্রমণ ও অধিকার হ'য়ে উঠল অসম্ভব। প্রকৃতি হ'ল দুর্য্যোগপূর্ণ। আক্রমণ অসম্ভব হওয়ায় সংযোগসূত্র রক্ষা করা কঠিন হ'ল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বাধ্য হ'য়ে পিছিয়ে চলল। জাপানের প্রধান সেনাপতি ও বর্ম্মা সরকার রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্রের ফৌজ তাঁদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করল।

সুভাষচন্দ্র তাঁর নির্দ্দেশনামায় বললেন—

"১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হ'তে আপনারা যেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং এখনও চালাচ্ছেন, আজ

গভীর বেদনার সহিত আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—কিন্তু এ প্রথম চেষ্টা মাত্র, আমাদিগকে এখন আরও অনেক চেষ্টা করতে হ'বে। আমি চির আশাবাদী, কোন অবস্থাতেই পরাজয় মানব না আমি। ইম্ফলের এই সমতল ভূমিতে, আরাকানের এই অরণ্য অঞ্চলে, ব্রহ্মের তৈলের খনি ও অন্যান্য স্থানে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকবে।"

ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ্ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্

২১শে এপ্রিল
১৯৪৫ সাল

সুভাষ চন্দ্র বসু
আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক

২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র তাঁর গভর্ণমেণ্টের সব-কিছু নিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যান। ভারতীয়গণের জন্য তিনি মেজর জেনারেল লোকনাথের অধীনে হাজার সৈন্য রেখে সব ব্যবস্থা ক'রে যান—সকল দায়িত্ব দিয়ে যান সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি জে. এন. ভাদুড়ীর উপর।

মাসাধিক কাল পরের কথা। ২৮শে মে ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্তৃপক্ষ উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করেন! পরিচালকের অভাবে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের সব-কিছু বন্ধ হ'য়ে গেল। দলে দলে গ্রেপ্তার হলেন আজাদ হিন্দের সবাই। জাপানের অধঃপতন ও আত্ম-সমর্পণের ফলেই আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘকেও আত্ম-সমর্পণ করতে হ'ল।

আজাদ হিন্দের আত্ম-সমর্পণের পর গ্রেপ্তার-করা আজাদ

হিন্দের লোকদের ভারতে আনা হ'ল। অনেককে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বেছে বেছে কয়েক জনের বিচার করা হ'ল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর। দিল্লীর লাল কেল্লায় চলল—ক্যাপ্টেন্ শা' নওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি. কে. সাইগল ও ক্যাপ্টেন্ গুরুবক্স সিং ধীলনের বিচার।

দেশব্যাপী সে কি উত্তেজনা! সাতজন অফিসার নিয়ে গঠিত হ'ল সামরিক আদালত।

এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার এন্. পি. ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়ানস্ সমর্থন করলেন সরকার পক্ষ। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও ভুলাভাই দেশাই অভিযুক্তগণকে সমর্থন করলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ ও নরহত্যার অভিযোগ আনা হ'ল।

সে কি আড়ম্বরের বিচার প্রহসন! যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হ'ল—জঙ্গী লাট বাহাদুর সবাইকে মার্জ্জনা করলেন; না হ'লে দেশের যে কি হ'ত কে জানে!

সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন্ রশিদকে সাত বছর কারাদণ্ড ও ক্যাপ্টেন্ বুরহামউদ্দিনকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হ'ল।

এই বিচারে সর্ব্বাধিক বিচিত্র হয়েছে, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যবৃন্দের আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ।

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা সুভাষচন্দ্র আরও একটি সৈনিক দল গ'ড়ে তুলেছিলেন। জার্ম্মানগণ তাঁদের নাম দিয়েছিলেন 'ফ্রি ইণ্ডিয়া'—তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৩৫০০ এবং ১৫টি দলে বিভক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন্ত ঊষা

"পূর্ণ মানব বাঁধনহীন
আনিবে ভূতলে নূতন দিন,
আঁধার হইবে আলোকে লীন
উদিবে গগনে নব তপন।"

—বিজয়লাল

বাংলার ইতিহাসে "অন্ধকূপ" এক দারুণ মিথ্যা অপবাদ; আর এই মিথ্যার উপরে ভিত্তি ক'রে বিজয়ী, স্বার্থপর ইংরেজ গ'ড়ে রেখেছিলেন রাজধানী কলকাতার বুকে ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে "হল্‌ওয়েল্ মনুমেণ্ট"। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের বিরুদ্ধে এই দুরপনেয় ঐতিহাসিক অসত্যের অপপ্রচার অপসারণ করতে সুভাষচন্দ্র চেষ্টিত হলেন। সরকারকে জানালেন যথারীতি এ দাবী। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করলেন না।

সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় এই আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ ও বহুব্যাপক হ'য়ে উঠল। অনেক কিছুর পর সুভাষচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বে সরকারের পরাজয় ঘটল। সরকার অবশেষে সেই প্রস্তরীভূত জমাট মিথ্যা স্তম্ভকে অপসারণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে সরকার গ্রেপ্তার করলেন।

এ ছাড়াও তাঁর অপরাধ ছিল ; 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার তাঁর প্রবন্ধ "হিসাব নিকাশের দিন" রাজদ্রোহজনক ব'লে সরকার সাব্যস্ত করেছিলেন। মোহম্মদ আলি পার্কের এক বক্তৃতাও রাজদ্রোহকর ব'লে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সুভাষচন্দ্র ছিলেন হাজতে—হাজতে তিনি সরকারের অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে অনশন সুরু করলেন। সরকার ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে প্রকারান্তরে মুক্তি দিলেন। নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ রাখলেন।

এই কারাগারে বাসকালেই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র পুনরায় সগৌরবে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

এর আগে—১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ—তিনি রামগড়ের আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতি হন।

কোনদিন তিনি আপোষ বা খোসামুদীর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রিয় কংগ্রেসের পরিচালকগণ সংগ্রামের পক্ষপাতী না হ'য়ে বলপূর্ব্বক অধিকার আদায় করবার চেষ্টা না ক'রে অহিংস অসহযোগের পথে চললেন।

এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ভারতের শাসক মহাশয়ের নিকট এক শেষ পত্রে লিখলেন—"আমার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থা দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠেছে, বে-আইন ও অন্যায়ের সহিত আপোষ ক'রে নিজের চিরন্তন সত্তা ক্রয় করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। এই মূল্য দান করা অপেক্ষা আমি বরং অনশনে আমার জীবন উৎসর্গ করব। * * * অদৃষ্টচক্রের

পরিবর্ত্তনে ইংরেজ একদিন ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'বে। কিন্তু তখন তাঁরা কিরূপ ভারত রেখে যাবেন! সে কি ভীষণ দুর্দ্দশা?"

ব্যক্তিত্বের কাছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করাকে সুভাষচন্দ্র অপরাধ ভাবতেন। ছোটবেলা হ'তে তিনি যুগাবতার পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের আদর্শে নিজের প্রবৃত্তিকে সংস্কৃত ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মতে মত ভিন্ন হ'লেও পথ কখনও ভিন্ন হ'তে পারে না। গান্ধীজী কংগ্রেসের নায়ক, তাঁর কাজেরও প্রতিবাদ তিনি না ক'রে পারেননি। আশ্চর্য্য এই যে সারা পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি গান্ধীজীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও ইতস্ততঃ করেননি। আবার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা; আত্ম-কলহের অপেক্ষা আত্মত্যাগকে তিনি ভাল মনে করতেন।

সুভাষচন্দ্রের মত লোক বাংলায় অতি অল্পই আবির্ভূত হয়েছেন—হননি বললেও বুঝি অতিরিক্ত ক'রে বলা হয় না। গুণগ্রাহী ইউরোপ বিপুলভাবে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। ইটালীর রোমের এশিয়াবাসী ছাত্র-সম্মেলনে তিনি মুসোলিনী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন; তাঁর সর্ব্বত্র বিশিষ্ট সম্মান ছিল। দেশে ও বিদেশে তাঁর মত সম্মান বোধ হয় কেউ পাননি।

তাঁর মত প্রবল প্রতাপান্বিত লোকের কথা বড় শোনা

যায় না ; যিনি নেপোলিয়ানের চেয়েও সম্মানিত সেই পৃথিবীর ভয়ানক জার্ম্মানীর হের হিটলারও সুভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ক'রে একদিন মুক্তকণ্ঠে সমবেত ভারতীয় সৈন্য ও তাঁর সৈন্যগণকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন—

"এই সুভাষচন্দ্র আমার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি তোমাদের এই আট কোটি জার্ম্মানের অধিনায়ক, কিন্তু এই সুভাষচন্দ্র আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মনোরাজ্যের অধিনায়ক।"

হিটলার নিজে বিশেষ যত্নে সুভাষচন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও কার্য্য-পরিচালনার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাঁকে দিয়েছিলেন। সর্ব্বপ্রধান যানবাহন তাঁকে দিয়েছিলেন।

যদি দিন আসে ভারতবাসী দেখবেন—কি সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন তাঁকে। জার্ম্মানগণ ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর যাবতীয় কার্য্যাবলীর ছায়াচিত্র গ্রহণ করেছিল। পৃথিবীর ত্রাস হিটলার মহামান্য নেতাজীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন অভিবাদন করেছেন সমবেত সেনাদের সামনে, বলেছেন—স্বাধীন ভারতের ইনি ফুরার—সর্ব্বাধিনায়ক।

সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি শুধু মুখের নয়—তিনি হিটলারকে বলতে ইতস্ততঃ করেননি, "সাহেব, তোমার লেখা ঐ 'মেইন্ ক্যাম্প' বইখানিতে আমাদের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে-সব গ্লানি লিখেছ, সে-সব তুলে দাও।" তিনি স্বীকৃত হলেন ও-সব গ্লানিকর কথা তুলে দিতে তাঁর সেই বহুল প্রচারিত

বই থেকে। দেশের জন্য এত কষ্ট অন্য কোন নেতা কোথাও কোন দিন করেন নি—এ কথা আমরা বলবই। কি তাঁর স্বদেশপ্রীতি।

জীবন-মৃত্যুর সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে সেই মহাদুর্দ্দিনে সুভাষচন্দ্র একাদিক্রমে তিন মাস চেষ্টা ক'রে সাব্‌মেরিনে বার্লিন হতে জাপানে গিয়েছিলেন! আর কেউ কি পারেন? পারেননি, আর পারবেনও না বুঝি। বার্লিন হ'তে জাপানে যাওয়া যেমন তেমন বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল না; পৌঁছুবার কোন আশাই ছিল না—তবু সেখানে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি জাপানী রাষ্ট্রদূতের কাছে শুনেছিলেন, সেই সুদূর প্রাচ্যে অন্য এক ভারতীয় গৌরব রাসবিহারী বসু মহাশয় এক বিরাট ভারতীয় বাহিনী সংগঠনের আয়োজন করছেন। তাঁর সেই স্থানে, সেই সময়ে উপস্থিতি নিতান্ত ও একান্ত প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন—ইউরোপ হ'তে সরাসরি তিনি ভারত অভিযান করবেন না। ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তের মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করাই অধিকতর সুবিধা-জনক হ'বে। জার্ম্মানীতে ভারতীয় সৈন্যগণ একে অন্যকে অভিবাদন করতেন "জয় হিন্দ্‌" ব'লে— জার্ম্মানীতেই উদ্ভব হয়েছিল এ মহামন্ত্রের—তার উদ্‌গাতা—ঋষি সুভাষচন্দ্র।

তিনি পুনঃ পুনঃ কারাবাসী, পুনঃ পুনঃ দেশান্তরিত, পুনঃ পুনঃ দ্বীপান্তরিত ও পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। অসাধ্য উপায়ে তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন—বৃটিশের মত ধুরন্ধরদের চোখে ধূলো দিয়ে।

জলের নীচে দিয়ে বার্লিন হ'তে জাপান গেলেন। তারপর আজাদ হিন্দ্ গঠন, আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ ব্রহ্মদেশে সে কি দুরূহ ব্রতোদযাপন!

দেখেছি, সুভাষচন্দ্রের সৌম্য, শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি! একত্র কেটেছে কত দিন— কত রাত। নবজাত শিশুর উজ্জ্বল নয়নের মত তাঁর নির্ম্মল দৃষ্টি সমগ্র হৃদয় উদ্বুদ্ধ করত। তাঁর সেই প্রশস্ত ললাট, তাঁর সেই চন্দ্র-জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্রতার প্রভাব উন্মাদ করত দেশকে, তাঁর স্থির, ধীর, গম্ভীর, বাণী-মন্ত্রে কার না চিত্ত নৃত্যপরায়ণ হ'ত? এমন প্রকৃতি, এমন দেব-মূর্ত্তি কোথায় দেখবো?

বাংলার দ্বিতীয় বিবেকানন্দ এই সুভাষচন্দ্র। স্বর্গীয় রাসবিহারীর সর্ব্বাধিক প্রচেষ্টা সুভাষচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হ'য়ে মণিকাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় কি অপূর্ব্ব আশার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন ক'রে সেনানায়ক গঙ্গাসিংয়ের সঙ্গে দেবনাথের আগমন ও তাঁর সংবাদ-প্রাপ্তি আমাদের প্রাণকে আজও হিল্লোলিত করে। যে সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতে স্বাধীনতা আনয়নের স্পৃহা সুভাষের মনে জেগেছিল তা সিদ্ধ হ'লে ভারতের স্বাধীনতা দিব্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত। সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হ'তে আজ পর্য্যন্ত দেশবাসীকে এত নির্য্যাতন সইতে হ'ত না; বিখণ্ডিত বাঙ্গালীকে বাস্তুহারা হ'য়ে এত হাহাকার করতে হ'ত না।

সংগ্রামের মধ্যেই দেশবাসীকে সংগ্রামশীল করে তুলতে হ'বে। তোমার যুক্তি ছিল ব'সে থাকলে সুযোগ আসবে না।

আপোষ-বিরোধী তাঁর আন্দোলন। তিনি সহায়করূপে পেলেন বিহার থেকে স্বামী সহজানন্দকে, পাঞ্জাব থেকে সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশেরকে, মধ্য-প্রদেশ হ'তে হরিবিষ্ণু কামাথকে, শালভদ্র যাজী প্রভৃতিকে। সবাই যোগ দিলেন পূর্ণোৎসাহে।

দুর্য্যোগের দিনে আশ্রয় চাই—সুভাষচন্দ্র কল্পনা করলেন এক বিশিষ্ট ভবন প্রতিষ্ঠার। সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে হ'ল স্থান সংগ্রহ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ করলেন তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, নাম দিলেন—'মহাজাতি সদন'। সুভাষচন্দ্রের সেই আশার ভবন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি—কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রাম আন্দোলন

মহাত্মাজীর অনুমোদিত নেতা হবেন কংগ্রেসের সভাপতি। এই নিয়ম চ'লে আসছিল কংগ্রেসের উপর মহাত্মাজীর প্রভাব প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। কিন্তু মহাত্মাজী বৃটিশের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির মনোবৃত্তিসম্পন্ন, পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্মত।

সুভাষচন্দ্রের মত এ-সব নয়। তিনি বলেন—আমি রাষ্ট্রপতিরূপে সারা বৎসর যে কাজ করেছি, যদি সে সকলের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে, দেশ যদি আমাকে না চায়, সে কথা আসন্ন নির্ব্বাচনে জানিয়ে দিক।

সুভাষচন্দ্রের এ-কথা বিরোধীদের মনঃপূত হ'ল না। তাঁরা

বিস্মৃত হলেন গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যক্তিত্বের মোহে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহী ভাব দেখে পছন্দমত প্রতিনিধি পট্টভী সীতারামিয়ার নির্ব্বাচন সমর্থন ক'রে এক বিবৃতি দিলেন।

গুরু-শিষ্যের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। মরমী কবিগুরু সুভাষচন্দ্রকে তাঁর শান্তিনিকেতনে ডেকে নিলেন। সুভাষের সে রবীন্দ্র-সংসর্গে ঘটল এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন :—

"রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব্ব উদয় গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ
নব জীবন রস ঢালে।"

গত বৎসরও কবিগুরু সুভাষচন্দ্রকে 'রাষ্ট্রপতি' সম্মানে বিভূষিত ক'রে বরণ করেছিলেন। এবার অপূর্ব্ব বাণী দ্বারা তাঁকে উৎসাহিত করলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সে সুভাষ-সম্বর্দ্ধনা-বাণী চিরদিন অমর হ'য়ে থাকবে। তিনি বললেন :—

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে, তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা দেখে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই। মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। এখন হিংস্র দুঃসময়ে পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হ'তে হবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি—এই আশা ক'রে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি। বাংলা দেশের অধিনেতাকে

আজ প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে ও মনে তাঁর সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিতেও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্ত্তব্যরূপে বাঙলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপর আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ ব'লে বরণ করেছ। দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হ'য়ে আসছে তোমার পুরস্কার বহন করে। বাঙালী কবি আমি, বাঙলা দেশের হ'য়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।"

এই দুঃসময়ের সন্ধিক্ষণে বিব্রত কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বাণীমন্ত্রে দিয়েছিলেন প্রেরণা।

তারপর এল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী—সারা ভারত স্তব্ধবিস্ময়ে শুনল—সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পট্টভি সীতারামিয়া অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও স্বয়ং গান্ধীজীর সহায়তাসত্ত্বেও ভোট পেয়েছেন প্রায় তেরশ' আর সুভাষচন্দ্র পনের শ'এর বেশী। গান্ধীজী অকপটে ব'লে ফেললেন, পট্টভির পরাজয় মানে আমারই পরাজয়। ৫২তম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র—সারা বাংলা তথা সারা ভারত উল্লাসমুখর। রাজ-নির্য্যাতিত বিদ্রোহী দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হলেন।

তাপ্তী নদীর তীরে বারদৌলী জেলার মধ্যে হরিপুরা গ্রাম।

এই গ্রামে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। মণ্ডপের নাম হ'ল বিঠলনগরী। ৫১টি তোরণ নির্ম্মিত হ'ল বিঠলনগরীর প্রবেশ-মুখে। শীর্ষদেশে উত্থিত করা হ'ল ৫১টি জাতীয় পতাকা—৫১টি বলিষ্ঠ বলদ চালিয়ে নিয়ে গেল সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র রথ। ৫১টি জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল এ অধিবেশনে। এমন আড়ম্বরে কোন দিন কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয়নি। সে কি আশ্চর্য্য শোভাযাত্রা!

তাপ্তী সৈকতের সেই বিশাল বিঠলনগরী মুহুর্মুহু কম্পিত হ'তে লাগল—'বঙ্গ-কেশরী কি জয়' ধ্বনিতে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী হ'ল এ অধিবেশন। এর আগে—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সুভাষচন্দ্র আফ্রিকার প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদাগাস্তিম শহরে গেলেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর।

তারপর সুস্থ হ'য়ে গেলেন ১০ই জানুয়ারী লণ্ডনে। সেখানকার ছাত্রেরা তাঁর বিপুল সম্বর্দ্ধনা করলেন! আইরিশ মনীষী ডি. ভ্যালারার সঙ্গে হ'ল আলাপ-আলোচনা।

এর পরে ২৪শে অক্টোবর তিনি এসেছিলেন ডালহৌসী সৈন্যাবাস হ'তে কলকাতায়, কংগ্রেসে তখন দলাদলি চলছে।

এই ডালহৌসী যাত্রার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র ৬ই এপ্রিল স্থানীয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট সভায় অভিনন্দিত হন।

সভাপতি রামানন্দ চ্যাটার্জি মহাশয় বলেন, 'সরকার যাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছিলেন, আমরা আজ তাঁর গলায় ফুলের মালা দিয়ে কিছুটা মনের ক্ষোভ মেটাতে চেষ্টা করছি।'

এই ডালহৌসী পাহাড়ে স্বাস্থ্যলাভের জন্য যাত্রার

পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র কিছুদিন কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকবার সুবিধা পেয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—চিকিৎসা করছিলেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়। তিনিই পাঞ্জাবের ডালহৌসী পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর আগেকার ঘটনা বড় মর্ম্মন্তুদ! সরকার জেলে ও অন্তরীণে রেখে সুভাষচন্দ্রকে বিপন্ন করে তুললেন। এর আগে ইউরোপ হ'তে তিনি ভারতে পদার্পণ করা মাত্র সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে আবদ্ধ করলেন যারবেদা জেলে। এই গ্রেপ্তারে সারা ভারতে দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল।

বিক্ষোভ শুধু মনে মনে রইল না। ১০ই মে ভারতীয়গণ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আয়োজন করলেন। তাঁরা "নিখিল ভারত সুভাষ দিবস" পালন করলেন। তাঁদের অসন্তোষের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হ'ল।

সরকার চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রকে যারবেদায় আটকিয়ে রাখা মুস্কিল হ'ল।

দশ দিন যেতে না যেতেই ২০শে মে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রের কার্সিয়াং-এর বাড়ীতে অন্তরীণ করলেন। কড়া পাহারায় রাখা হ'ল নিজেদের বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ।

এখানেও তাঁর কোন উন্নতি হ'ল না; অবশেষে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতালে। কয়েক মাস রেখে অগত্যা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিলেন। পাঁচ বছর পর হ'ল এ মুক্তি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চলেছিল লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের আয়োজন। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে। এই অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য সুভাষচন্দ্রের বড় ইচ্ছা হ'ল। তিনি ভিয়েনায় বৃটিশ দূতকে জানালেন—"আমি দেশে যাবই—এতে সরকার সম্মতি দেন আর না দেন।"

বৃটিশ দূত বললেন—"সরকারী আদেশ অমান্য ক'রে গেলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন না।"

নির্ভীক সুভাষচন্দ্র বললেন, "বিদেশে বন্দী হ'য়ে থাকার চেয়ে—আমি বরং দেশে বন্দী হ'য়ে থাকব—তাই আমার ভাল।"

'কান্টিভার্ড' জাহাজে তিনি যাত্রা করলেন। ক্রমে ৮ই বোম্বাইতে আসা মাত্র গ্রেপ্তার ক'রে তাঁকে পূর্ব্বোল্লিখিত যারবেদা জেলে আবদ্ধ করা হ'ল।

এইবার বলছি—১৯৩৩ হ'তে ১৯৩৬ অবধি তাঁর জীবনের কথা—এ হচ্ছে এক নির্ব্বাসিত জীবনমাত্র।

কিন্তু এই নির্ব্বাসন সময়ে বিদেশে তাঁর সম্মান হয়েছিল যথেষ্ট। বিদেশের সুধীবৃন্দ, প্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁকে নানা ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন।

বৃটিশ সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন এক ভয়ের বস্তু। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকায় তাঁর গমন নিষিদ্ধ করা হ'ল।

তাঁর সারগর্ভ নূতন বাণী, নূতন সুর দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল—"লণ্ডনের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে" ভারতের গণতান্ত্রিক

সমিতিতে লিখিত অভিভাষণরূপে। তাঁকে যেতে দেওয়া হ'ল না কোন ক্রমেই।

সবকারী নির্দ্দেশে সে সকলের প্রচার ভারতে নিষিদ্ধ হ'ল —সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হ'ল ইউরোপে অসামান্যরূপে আদৃত তাঁর রচিত "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" গ্রন্থ।

ভিয়েনায় অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ ডানিয়ের সুভাষচন্দ্রের দেহে করলেন অস্ত্রোপচার। স্বচ্ছন্দে তিনি ভিয়েনার বিখ্যাত ইউরোপীয়ান সোসাইটির সম্মেলনে যোগদান করলেন। মুগ্ধ হ'ল সবাই তাঁর অভিনব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে।

দেশ ছেড়ে তাঁকে ইউরোপে নির্ব্বাসনে হ'ল থাকতে সত্যি, কিন্তু তাঁর ইউরোপ প্রবাসে ভারতবর্ষের বহু উপকার সম্ভব হ'ল। তিনি পেলেন সেখানে নানা নূতন নূতন শিক্ষণীয় বস্তু —সারগ্রাহী হ'য়ে তিনি সেই সকল তাঁর স্বদেশের হিতার্থে নিয়োজিত করলেন।

বিভিন্ন রাষ্টে পরিভ্রমণ করলেন তিনি—দেখলেন ওদেশের লোক সবাই মানবতার দাবীতে অহর্নিশ চেষ্টা করছেন রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করতে।

সবাই চায় স্বাধীনতা। সবাই চায় মান-সম্মান, আত্ম-মর্য্যাদা; ভারতবাসীর মত কেউ কোথায়ও নেই ঘুমিয়ে। এক-একজন নেতা জাতিকে করছেন জাগ্রৎ, কত ভাবে জাতির প্রাণে করছেন উদ্দীপনার সৃষ্টি। ভারতকে কি জাগিয়ে তোলা যায় না এমন ক'রে? ভারতবাসীকে কি মাতিয়ে তোলা যায় না স্বাধীনতার নামে?

সুভাষচন্দ্রের ভিতরে ছিল অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অসাধারণ প্রতিভা, নেতৃত্ব করবার যাবতীয় গুণগ্রাম। তিনি বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত ছুটে আসতে চাইলেন তাঁর স্বদেশে।

একটু আগের কথা বলছি—সুভাষচন্দ্র সেই সুদূর প্রবাসে সংবাদ পেলেন, তাঁর পরমারাধ্য পিতা জানকীনাথ হয়েছেন অত্যন্ত অসুস্থ। এমন অসুস্থ যে, বাঁচবার আশা নেই।

পিতৃভক্ত পুত্র অসুস্থ পিতাকে দেখবার জন্য আকুল হ'য়ে উঠলেন। সরকার তাঁকে আসতে দেবেন না দেশে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চিরজেদী—তাঁর জেদ হ'ল তিনি দেশে আসবেনই। অগত্যা ভারত সরকার তাঁকে ভারতে এসে পিতাকে দেখে যাবার অনুমতি দিলেন।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতে অবতরণ করলেন। করাচীতে এসেই শুনলেন, দু'দিন আগে ২রা ডিসেম্বর তাঁর পিতৃদেবের তিরোধান ঘটেছে! জামসেদ মেটাজী তাঁকে এ দুঃসংবাদ দিলেন।

দারুণ পিতৃশোকে সুভাষচন্দ্র মুহ্যমান, সরকার তবু তাঁকে ছাড়লেন না। করাচীতে তিনি বিমান হ'তে অবতরণ করা-মাত্র করাচীর গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর সঙ্গে যে-সব জিনিষপত্র ছিল সব ওলট-পালট ক'রে—পাতি পাতি ক'রে খানা-তল্লাসী করল। তাঁর লেখা "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" মহাগ্রন্থের টাইপ-করা পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে গেল। পরে অবশ্য সে পাণ্ডুলিপি সরকার তাঁকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। দেশে ঐ গ্রন্থের প্রকাশ বন্ধের হুকুম দিলেও ইউরোপে উহা প্রকাশিত

হওয়ামাত্র লক্ষ লক্ষ বই বিক্রয় হ'য়ে গেল। এক মহাচাঞ্চল্যকর গ্রন্থ হ'ল এই "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল"।

স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্যই সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী গিয়েছিলেন ইউরোপে। যাবার সময় তিনি বাঙ্গালীদের ব'লে গিয়েছিলেন —বাঙলা যদি মরে তা'হ'লে আর কে-ই বা থাকবে বেঁচে?— বাঙলা যদি বাঁচে তা'হ'লে কে মরবে?"

৮ই মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় উপস্থিত হলেন। এক বিখ্যাত স্বাস্থ্য-নিবাসে তিনি উঠলেন।

ঘটনাক্রমে ভারতের প্রবীণ নেতা বিঠলভাই পেটেলও ছিলেন সেই স্বাস্থ্য-নিবাসে। তিনিও অসুস্থ। বল্লভভাই পেটেল মহোদয়ের দাদা ইনি। এই প্রেসিডেণ্ট পেটেলের স্নেহদৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র অভিষিক্ত হলেন। দু'জনে সেই রোগ শয্যাতেই স্থির করলেন—সারা দুনিয়ায় ভারতের দাবী— ভারতের আশা ঘোষণা করতে হ'বে। বাঙালী যা আজ ভাবে, কাল তা সারা ভারতের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পেটেল বললেন—"তুমি যা ভাবছো সুভাষ, তার জন্য অনেক টাকা লাগবে। আমি সে-সব দেব।" তিনি তাঁর উইলে বা চরমপত্রে সুভাষচন্দ্রকে দিয়েও গিয়েছিলেন সে টাকা। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা সে-সব নিতে দিলেন না তাঁকে।

মহাত্মাজীর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নীতির বিরুদ্ধে বিঠলভাই ও সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করলেন। দেশে তাতে নানা বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হল।

গোল টেবিল হ'তে মহাত্মাজী ফিরে এলে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হ'ল। সুভাষচন্দ্রও মফঃস্বল ঘুরে কলকাতা পৌঁছেই যোগ দিলেন এ কমিটিতে।

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা কংগ্রেসের নীতি ছেড়ে ভারতে ঔপনিবেশক স্বায়ত্ত-শাসনের সহযোগিতায় সম্মতি ও স্বাক্ষর দানে উদ্যত হলেন।

সুভাষচন্দ্র বিরোধী হলেন—তাঁর সঙ্গে ডাঃ কীচলুও প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদ ক'রে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরছিলেন—সরকার ভাবলেন একে কলকাতা যেতে দেওয়া হ'বে না—দিলে তাঁদের ঘটবে মহাবিপদ।

বোম্বাই থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে এসেছেন—কল্যাণ ষ্টেশন—সেখানে তিন রেগুলেশনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। মধ্য-প্রদেশের সিউনী জেল, সেখান হতে জব্বলপুরের সেণ্ট্রাল জেলে তাকে রাখা হ'ল আবদ্ধ করে।

এই বদ্ধভাবে নানা অনিয়মে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল।

জব্বলপুরে শঙ্কাজনক হ'ল তাঁর স্বাস্থ্য—তাঁকে পাঠানো হ'ল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে।

সেখান হ'তে লক্ষ্ণৌয়ের বলরামপুর হাসপাতালে। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ তাঁকে ইউরোপে পাঠাতে বললেন। সুভাষচন্দ্র যে এইভাবেই ইউরোপে গিয়েছিলেন তা আগেই বলেছি।

সুভাষচন্দ্র যখন দেশে ছিলেন, একদিনের জন্যও বিশ্রাম করবার অবসর পাননি।

হিজলী বন্দীশালার বন্দীদের উপর পুলিশের গুলি এই সময়কার ঘটনা। হিজলীতে খুন হ'ল অনেকে—এক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান তারকেশ্বর সেনও খুন হলেন।

বৃদ্ধার ক্রন্দন-রোল প্রবেশ করল স্নভাষচন্দ্রের কর্ণে। স্নভাষচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হ'য়ে এই বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে গেলেন বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে।

দেশের গৌরব স্নভাষচন্দ্র, সান্ত্বনা দিতে গেছেন পুত্রহীনা বিধবাকে—বাড়ীর উঠান ভ'রে গেছে লোকে।

স্নভাষচন্দ্র করুণ কণ্ঠে বিধবাকে বললেন—"মা, মা, চেয়ে দেখ মা, তোমার আর এক ছেলে!"

বৃদ্ধাকে নাইয়ে খাইয়ে শান্ত ও স্নস্থ ক'রে স্নভাষচন্দ্র অপরাহ্ণে যোগ দিলেন এক জনসভায়। কি বিচিত্র এ-সব!

এই বন্দীশালার হত্যাকাণ্ডে স্নভাষচন্দ্র সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ হ'য়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদে ইস্তফা দেন।

এর আগে তিনি "নিখিল ভারত নও-জোয়ান সঙ্ঘ", "নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনীতিক সঙ্ঘ"-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন।

এল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী—'স্বাধীনতা দিবস'। কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন—শোভাযাত্রা করা চলবে না। কিন্তু স্নভাষচন্দ্র এ-সব শুনবার ছেলে নন্। পুলিশ চালাল লাঠি। স্নভাষচন্দ্র সে লাঠিতে আহত হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ছ'মাসের জেল হ'ল।

এদিকে গান্ধী-আরউইন্ চুক্তির ফলে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। এই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উত্তর বাংলা পরিদর্শনকালে তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়। সাতদিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয় তাঁর।

কর্পোরেশনের মেয়র

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন। তিনি তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। ছাড় পেলেন তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর।

এর আগে—১৯২৭ হ'তে ১৯২৯ অবধি সুভাষচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক। এ সবই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ্। এই সময়ই তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মনোনীত হন।

পূর্ব্বেই পণ্ডিত জওহরলালজীর সঙ্গে একত্র হ'য়ে তিনি গড়েছিলেন "নিখিল ভারত স্বাধীনতা লীগ"।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ এক বিচিত্র বৎসর। এই বৎসরে কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন। এবার সভাপতি হলেন ভারতের অদ্বিতীয় আইনজীবী পণ্ডিত মতিলাল।

সুভাষচন্দ্র গড়লেন এক আশ্চর্য্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই বাহিনী গঠন ক'রে তিনি দেখিয়ে দিলেন, শিক্ষা পেলে ভারতীয়েরা সশস্ত্র রণ-বাহিনীর উপযুক্ত হ'তে পারে। জি. ও. সি. হলেন তিনি নিজে।

কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের মতের সঙ্গে মহাত্মাজীর মত মিলল না। পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ণ পক্ষপাতী সুভাষচন্দ্র বললেন—বৃটিশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক।

তাঁর কথা অনেকে শুনলেন, অনেকে শুনলেন না। তবু তিনি "হিন্দুস্থান সেবাদল"-এর সভাপতিরূপে সুনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই বললেন।

সুভাষচন্দ্রের এর আগেকার অবদান স্তম্ভিত করল সমগ্র ভারতকে। ছাত্রমণ্ডলীকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি সাইমন্ কমিশন্ বয়কট করলেন।

দেশবন্ধুর যুগ

বাংলা দেশে দেশবন্ধুর অখণ্ড প্রতাপ—সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রেরও প্রভাব বেড়ে গেল আশাতীতরূপে।

কর্ত্তৃপক্ষের এতটা সহ্য হ'ল না। তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে আলিপুর, বহরমপুর, তারপর নির্ব্বাসিত করা হ'ল মান্দালয়ে।

দেশবন্ধু বললেন—"দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়—তা' হ'লে সুভাষ কেন, আমিও তো অপরাধী।"

কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্রকে দেশবাসী করলেন ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি। কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে তিন হাজার টাকার স্থলে তিনি নিতেন দেড় হাজার।

সরকারী কোপ-দৃষ্টি চলল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে হ'ল গয়ায় কংগ্রেস—দেশবন্ধু সভাপতি।

প্রিয় সুভাষচন্দ্র তাঁর সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গী। গান্ধীজীর সঙ্গে হ'ল মতদ্বৈধ—পণ্ডিতজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র গড়লেন "স্বরাজ্য দল"।

রাজনৈতিক বাংলা সংবাদপত্র "বাংলার কথা" চালালেন সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বের করলেন "ফরওয়ার্ড" দৈনিক। সুভাষচন্দ্র সব-কিছুতে আছেন, তা'ছাড়া গড়লেন "বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘ"।

যুবরাজ ও সুভাষচন্দ্র

সেদিন ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ এসেছিলেন ভারত পরিদর্শনে। ভারতের দরিদ্র প্রজার কোন কথাই শোনেন না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা—তাঁদের রাজপুত্রকে কেন সেই ভারতবাসী করবেন সম্বর্দ্ধনা?

সারা ভারতে ঘোষিত হ'ল হরতাল—দোকানপাট, কাজ-কর্ম্ম, গাড়ীঘোড়ার চলাচল সব বন্ধ। এর পরিচালক সুভাষ।

চির বিদ্রোহী তিনি। কি তাঁর সে সংগঠন শক্তি!

জনমানবহীন হ'ল কলকাতার রাস্তাঘাট—কর্ম্মস্থল। সরকার স্তম্ভিত হলেন।

২০শে নভেম্বর সরকারী উগ্র শাসন আরম্ভ হ'ল। সভা, শোভাযাত্রা বন্ধের হুকুম হ'ল। একদিকে এই সরকারী হুমকী—শত নির্য্যাতন চেষ্টা, অন্যদিকে দেশের জনক, জাতির জনকের প্রবর্ত্তনায় আরম্ভ হ'ল—অসহযোগ।

১০ই ডিসেম্বর—

মৌলানা আজাদ, শাসমল, সুভাষচন্দ্র এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাসহ দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের হাজত হ'ল তিন মাস, ছ'মাস হ'ল কারাদণ্ড।

একই জেলে দু'জন। সুভাষচন্দ্র রান্না করেন—দেশবন্ধু খান। তিনিই তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী—তা'ছাড়া মনস্তত্ত্ব শিক্ষা দেন দেশবন্ধুকে। কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ মনস্তত্ত্ব-ডিগ্রীধারী সুভাষচন্দ্র।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পেলেন। কিন্তু এমন এক দুরূহ কর্ম্ম এল সুভাষচন্দ্রের সম্মুখে যে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

উত্তরবঙ্গে হ'ল দারুণ বন্যা—বন্যা-নিপীড়িতদের ত্রাণে অলৌকিক কর্ম্মতৎপরতা দেখালেন তিনি। তাঁর জয়-জয়কারে দেশ ভ'রে উঠল।

অগ্নিযুগ

গান্ধীজীর অসহযোগে সারা দেশ টলমল।

দেশবন্ধু—সর্ব্বজনপ্রিয় বাঙ্গালী নেতা—কি বিরাট তাঁর ত্যাগ—কি অসামান্য তাঁর বাগ্মিতা—কি অদ্ভুত তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা।

লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। দেশের এই বহ্নিময় সময়ে সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকে এসে অবতীর্ণ হলেন। স্বদেশে এসেই তিনি ভারত-কর্ণধার গান্ধীজীর সঙ্গে করলেন সাক্ষাৎ। গান্ধীজী অসাধারণ প্রতিভাশালী সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন অসাধারণ দেশবন্ধুর নিকট।

মণি-কাঞ্চন সংযোগ হ'ল। অসহযোগের ফলে ভেঙ্গে গিয়েছিল সব সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দেশবন্ধু খুললেন জাতীয় বিদ্যালয়—যোগ্যতম সুভাষচন্দ্র হ'লেন এই নব-প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ। গ'ড়ে তুললেন স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে,—যা তাঁর একান্ত প্রিয়।

ছাত্র সুভাষচন্দ্র সিভিল্ সার্ভিসের মোহ ত্যাগ ক'রে অবতীর্ণ হলেন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে, রাজনীতিতে।

তাঁর অসাধারণ সব কাজ ও বক্তৃতায় সারা দেশ একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল।

তিনি বলতে লাগলেন—"সুদূর ভবিষ্যতের স্বাধীনতার প্রার্থী নই আমরা। এ মহামূল্য সামগ্রী আমাদের অবিলম্বে প্রাপ্য। স্বাধীনতা—জাতীয় আন্দোলনের ঊষা হ'তেই—পূর্ণ স্বাধীনতা—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নয়।

আপোষে আসবে না এ স্বাধীনতা।"

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের" বা গৌড়ীয় সর্ব্ব-বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারাধ্যক্ষ এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধ্যক্ষ হলেন।

ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব আই. সি. এস্. পদত্যাগ-পত্রের প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্মতি দিলেন না।

আই. সি. এস্. উত্তীর্ণ হ'য়ে আত্মপ্রসাদ নেই তাঁর—মনো-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানে তিনি ট্রাইপোজ সহ—কেম্ব্রিজের

জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পড়তে লাগলেন। উত্তীর্ণ হলেন ট্রাইপোজ সহ বি. এ.।

ইংলণ্ডে উপনীত হবার মাত্র ৮ আট মাস পরে তিনি সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দেন। অত অল্পদিন পড়েও তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এত কঠিন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাতে এমন কৃতিত্ব অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র অভিভাবকদের আদেশ লঙ্ঘন করবার ছেলে ছিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিভিল্ সার্ভিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা প্রদানের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন।

তাঁর সমগ্র পরিবার উচ্চশিক্ষিত—তাঁকে সকলের চেয়ে বড় করবার ইচ্ছা তাঁর বাবার। তাই পিতা তাঁকে পাঠালেন সবার উপর স্থান গ্রহণ করবার অভিলাষেই। ম্যাজিষ্ট্রেট্ হবেন—জজ হবেন তিনি।

তখন তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পড়ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অনার্স ছাত্র সুভাষচন্দ্র

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ইণ্টারমিডিয়েট্ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছিলেন। কটক ছেড়ে এসে কলকাতার সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষায়তন "প্রেসিডেন্সী কলেজে" ভর্ত্তি হলেন!

তু' বৎসর আগে সুভাষচন্দ্র কটক র‍্যাভেন্‌শ স্কুল হ'তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে দ্বিতীয়

স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন কলকাতা মিত্র ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার মহাশয়।

তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার "আমার বন্ধু সুভাষ" গ্রন্থে লিখেছেন :—

"সুভাষ আসলে ছিল 'যোগী'—'মনস্বী'—কর্ম্ম-জীবনের প্রচণ্ড সংঘাতে তার এই আধ্যাত্মিক দিকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।……তবু আমি বলব সুভাষের মধ্যে ছিল একটি যোগীর মন,—পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই জাগতিক ব্যাপারে মনোনিবেশ না করে সে যদি পরমাত্মার সাধনায় মগ্ন হয়ে যেত তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ সাধক হতে পারত। পার্থিব বিবেকে সে যদি জড়িয়ে না পড়ত, তবে সে এই জীবনেই মানুষের পরমকাম্য চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারত। * * তাঁর প্রিয়তম ভক্তদের জন্যই মায়াজাল বেশী করে বিস্তৃত হয়।"

"জ্ঞানের অহঙ্কারে অজ্ঞেয় অজানা কিছু নেই বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি—কিন্তু এই 'অজ্ঞেয়'র ডাক আমাদের মাঝে মাঝে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে—একথা তো মিথ্যা নয়। যখন সহস্র কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে আছি, তখনই হয়ত শোনা যায় রহস্যময় অজানার পদধ্বনি, সমগ্র সত্তাকে তোলপাড় করে বুনে দিয়ে গেল প্রেমের বীজ। হয়ত এক টুক্‌রো সৌন্দর্য্যের হাল্‌কা স্পর্শে উতলা হয়ে উঠলো মন পরম প্রিয়তমের প্রতি নিবিড় অনুরাগে।

এই রকম অজানার ডাকেই সুভাষ ষোল বছর বয়সে গুরুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তার যদি তখন

গুরু লাভ ঘটতো, তাহলে জীবনের গতি যেত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। গুরু লাভ তার হয়নি বটে, কিন্তু কৈশোরে যে অমর বীজ তার মধ্যে উপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলি স্বপ্নবৃক্ষে পরিণত হয়ে উঠেছিল— তাই শত কর্ম্মের ঝঞ্চনার মধ্যেও হঠাৎ দেখি তার উদাস-করুণ আত্ম-বিস্মৃতি আর অদ্ভুত বিষণ্ণ স্থৈর্য্য। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য—এই স্বপ্নাশ্রয়ী সুদূরপ্রসারী অধ্যাত্মবাদ, তার প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মকোলাহলে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি।”

সুভাষচন্দ্র উচ্চ শিক্ষার জন্য কটক ছেড়ে কলকাতায় এলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে এসে তিনি মগ্ন হলেন মাধ্যমিক পড়াশুনায়।

দক্ষিণ কলকাতার এল্‌গিন রোডে—সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ তখন প্রকাণ্ড বাড়ী করেছিলেন, সেই বাড়ীতে থেকে সুভাষচন্দ্র মধ্য-কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ‘ইন্টারমিডিয়েট’ পড়তে লাগলেন।

বিষয় বেছে নিলেন তিনি—ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃত, গণিত ও লজিক। ভাল নম্বর বা মার্ক রাখবার সাবজেক্ট এগুলিই। ভাল ছেলেরা এই সাবজেক্টগুলিই সাধারণতঃ নিয়ে থাকেন।

পড়াশুনা চলল। কলেজের ছেলে সুভাষচন্দ্র—পিতার লোভনীয় সম্মান, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য—নিজের সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি, মনোরম স্বাস্থ্য, অসামান্য প্রতিভা।

তা’ছাড়া যে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরবর্ত্তী জীবনে মূর্ত্ত হ’য়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে—তার অনেক

পরিচয় প্রকাশিত হ'তে লাগল সেই সুকুমার ছাত্র-জীবনেই। সহপাঠীরা বিবিধ ভাবে নানা সূত্রে সে সকলের প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হ'তে লাগলেন সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠতায়।

ছাত্র—পড়াশুনাই তাঁর কর্ত্তব্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্র পড়া-শুনায় যেমন অতি মনোযোগী ছিলেন, তেমনি ছিলেন জনসেবায়। স্বজাতির প্রতি অনুরাগে, পরোপকার প্রবৃত্তিতে তিনি হ'য়ে উঠলেন তখনকার ছাত্র-সমাজের আদর্শ।

এক-এক সময়ে দেশে এক-এক ভাবের বন্যা আসে। সুভাষচন্দ্রের প্রিয় সঙ্গীদের মধ্যে বাছা বাছা কয়েকটি মেধাবী ছেলে অনুপ্রাণিত হলেন এক বিচিত্র দার্শনিক ভাবে।

তাঁরা দল বেঁধে—মধ্য কলকাতার ৩নং মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে খুললেন এক আত্মোন্নতি সমিতি।

বর্ত্তমান স্বাধীন বাংলার পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও স্বনামধন্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবর্ত্তন করলেন এই সমিতির।

বহু ছেলে এ সমিতির সভ্য হলেন। সকলেই অসাধারণ, দেশসেবা হ'ল তাঁদের প্রধান কার্য্য। দেশসেবা করবেন তাঁরা চির-কৌমার্য্য ব্রত নিয়ে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অনেক প্রভাব তাঁদের উপর পড়েছিল।

সুভাষচন্দ্রও জড়িত হলেন এই সমিতিতে। ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে তিনি ব্রত নিলেন—"চির-কৌমার্য্যের"—চিরদিন কুমার বা অবিবাহিত থাকবেন—বিয়ে করবেন না সারা

জীবন। মহাভারতের ভীষ্ম পিতার সন্তুষ্টির জন্য চিরকুমার ছিলেন। তাঁর মত বীর সারা ভারতে আর ছিল না। পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি পেয়েছিলেন 'ইচ্ছামৃত্যু' বর। তাঁর মত জ্ঞানী গুণী কেউ ছিলেন না ব'লেই লোকে এখনও বলে ভীষ্মই মহাভারত—মহাভারতই ভীষ্ম—তাঁর অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানময় উপদেশ-নিচয় মহাভারতকে করে রেখেছে পরমোজ্জ্বল নীতিশাস্ত্র—মহাভারতের মহাযুদ্ধের তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান সেনাপতি। তাঁর শরশয্যা গ্রহণের পর হ'তেই অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের পরাজয়ের সূচনা হ'ল।

রামায়ণের রামানুজ লক্ষ্মণ অনেকটা এইরূপ ব্রহ্মচারী মহাবীর; কিন্তু তিনি উর্ম্মিলার স্বামী,—বিবাহিত।

ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন কটকের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুল ছেড়ে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশিকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, সেই সময়েই বর্ষার বারিধারা-সম্পাতে সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় সুভাষচন্দ্রেরও মনোক্ষেত্রে প্রসুপ্ত বীজাবলী জেগে উঠল।

র‍্যাভেন্‌শ স্কুলেই পরিচয় হ'ল ভগবান রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের সহিত—তাঁর প্রধান শিষ্য ও বাণী-প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দজীর কার্য্যাবলী তাঁকে উন্মাদনা দান করতে থাকে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায়। সুকুমার কিশোর সুভাষচন্দ্র রোগীর শুশ্রূষায়, দুঃখীর দুঃখ-মোচনে, দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ব্যাপৃত হন। নিয়তির বিধানে তাঁর সেই র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব

দাস, এম. এ.। কলকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হ'তে পেন্‌সন্ নিয়েছেন তিনি।

অত্যন্ত ধার্মিক—অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এই দাস মহাশয়। এঁরই কন্যা স্বনামধন্যা শ্রীমতী বীণা দাস—যিনি কন্‌ভোকেশন সভায় বাংলার গভর্ণরকে গুলি করেছিলেন। স্বদেশের জন্য দুঃসাহসিকা এ মেয়ে।

নানাভাবভূয়িষ্ঠ অতি-প্রশংসিত এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন হ'য়ে উঠেন সুভাষচন্দ্র। একে তো মহাপ্রতিভাবান উৎকৃষ্ট ছাত্র—তাতে অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি —ততোধিক বিনয়মধুর বলিষ্ঠ চরিত্র। তিনি দিতে লাগলেন বিচিত্র সব সাধু উপদেশ, পরশমণির স্পর্শে পুলকিত হলেন সুভাষচন্দ্র। এই সবই তো তাঁর চাই!

নানারকম বই পড়তে লাগলেন—ভারতের দর্শনশাস্ত্র হ'ল তাঁর প্রিয় পাঠ্য—তরুণ মনে জেগে উঠল অভিনব এক চেতনা।

সব-কিছু অসার বোধ হ'তে লাগল তাঁর। মহাপুরুষ—কোথায় সেই মহাপুরুষ, যাঁর সংস্পর্শে পাব সত্যের সন্ধান।

ভাল লাগছিল না কিছু—কি এ অশান্তি? কিসের জন্য এ অশান্তি?

ধনীর দুলাল তিনি—পার্থিব উন্নতি তো সবাই করে—সে তো কিছু নয়—তাঁর মনোজগতে প্রাবল্য জন্মাল ধর্ম্মের। গৃহ—সে তো এক কারাগার—সে তো এক বন্দীর বন্ধনদশা! এ কি রহস্য!—

মীমাংসা চাই—কিসে হ'বে এর মীমাংসা ? শুনেছেন তিনি, পড়েছেন তিনি যে তাঁরই জন্মভূমিতে এসেছিলেন একদিন বুদ্ধদেব। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৬ সালের কথা। রাজপুত্র রাজ-সংসার, রাজৈশ্বর্য্য ছেড়ে, অপরূপ সুন্দরী প্রিয়তমা পত্নী গোপা ও নবজাত পুত্র রাহুলকে ছেড়ে ছুটে চললেন—খুঁজতে লাগলেন—সে কি খুঁজলেন তিনি ?

পৃথিবীর দুঃখ—পৃথিবীর ক্লেশ নিবারণের উপায়। এই সিদ্ধার্থের—এই বুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে মহাকবি, মহানাট্য-কার মহাপুরুষ গিরিশচন্দ্র একদিন বলেছিলেন,—তপোবলে

"শুদ্ধচিত্ত, ধরা পবিত্র কর, নব তপাচারী—
পৌরুষ যশঃ পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী,
সিদ্ধ অর্থ—জগত-মিত্র—উত্তম প্রচারী,
উচ্চ বিভব-গৌরব-লাভ বিঘ্ন-বাধা বারি,
জয় জয় জয় পরহিতব্রত আশ্রিত ভয়হারী।"

এত গুণবান্—এত ধনবান্—সব ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হ'ল তাঁর, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি চাইতে লাগলেন অজানাকে।

'অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা !'

—রবীন্দ্রনাথ

ব'লে তিনি ছুটে চললেন একদিন।

ভাবে বিভোর সুভাষচন্দ্র নবদ্বীপের অদ্ভুত সন্ন্যাসী নিমাই পণ্ডিতের মত চললেন। কোথায় চললেন ?

হিন্দুর তীর্থে তীর্থে থাকেন মহাপুরুষেরা—তাঁদের কারও সঙ্গের পরশমণির স্পর্শ যদি ঘটে, এই ভেবে বুঝি চললেন।

বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর, নানক, তুলসীদাস, নরোত্তম ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—সবার কথাই জানতেন তিনি।

'সুভাষ—সুভাষ কোথায় ?' সারাবাড়ীতে এই হাহাকার।

পিতা জানকীনাথ তখন সপরিবারে কলকাতার বাড়ীতে। ধৈর্য ধারণ সহজ হ'ল না—তবু উপায় তো নেই, অনুসন্ধানের যত রকম উপায়, সব অবলম্বিত হ'ল। আত্মীয়-স্বজন, সুভাষের প্রিয়জন, সবার নিকট খোঁজ করা হ'ল—অর্থব্যয়ে, মানুষের চেষ্টায় যতটা সম্ভব, কিছু বাকী রাখলেন না স্নেহময় পিতা।

জননী প্রভাবতী দেবী, ধাইমা সারদা নিতান্ত অধীরা হয়ে পড়লেন।

নিশির ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথ—পদে পদে কত বিঘ্ন, কত অন্তরায়; হাঁটবার নেই তেমন অভ্যাস—অনাহার, অসময়ে আহার—রোদ, বৃষ্টি, সে-সব ভেদ ক'রে চলেছেন সুভাষচন্দ্র—তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, নদীর সৈকতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে।

কিন্তু কোথায় তিনি? যাঁকে সুভাষচন্দ্র প্রার্থনা করছেন মনে প্রাণে?

শ্রদ্ধা নিয়ে যান, বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ফিরে আসেন নব জটাজূটমণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীর আভ্যন্তরীণ দুর্দ্দশা লক্ষ্য

করে। গৃহীর চেয়েও ভোগী তাঁরা—সংসক্ত, আসক্ত তাঁরা, বিলাসী তাঁরা।

হরিদ্বার থেকে এলেন বারাণসীতে ; ঠাকুর পরমহংসের প্রিয় শিষ্য রাখাল মহারাজের সঙ্গে হ'ল সাক্ষাৎ।

তিনি বললেন, "সুভাষ, এ তো তুমি ভাল করনি—মা বাবার মনে কষ্ট দিয়ে সাধুর সন্ধানে বেরিয়েছ ? এ তো ভাল কথা নয়। ফিরে যাও বাবা, সময় হ'লে—আকিঞ্চন থাকলে, তোমার সাধু নিজে গিয়েই ধরা দেবেন তোমায়।"

এ কি সত্যসন্ধ বাণী! সুভাষচন্দ্রকে তো এতদিন এমন কথা কেউ বলেননি—সবাই বলেছেন কত চাটুবাক্য।

সুভাষচন্দ্রের মনে অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটল। স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে তিনি যথাসম্ভব দ্রুত চললেন কলকাতার বাড়ীতে।

সহসা সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন।

উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, আকুল-ব্যাকুল বাড়ীতে ছুটল আবার সন্তোষ ও আনন্দের কলরোল। যাঁদের ছেলে হারিয়ে গেছে, খুঁজে খুঁজে পেয়েছেন অথবা হঠাৎ হারানো ছেলেটি এসে বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাঁরাই জানেন সে কি আনন্দ! প্রিয় কোন বস্তু হারিয়ে গেলে, আবার তা পেলে সে যে কি আনন্দ, যাঁরা ফিরে পান তাঁরাই জানেন। হারানিধি ফিরে পেলেন পিতা জানকীনাথ, মাতা প্রভাবতী।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বাবাকে বললেন ঃ—"আমি বুঝিনি, ভুল করেছিলাম।"

সুভাষচন্দ্র পড়া ছেড়ে চলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক সময় নষ্ট করেছিলেন। এইবার আবার চলল পড়াশুনা। কিন্তু পরীক্ষার দিনের বেশী বাকী ছিল না। অনেকে ভাবলেন, এবার পরীক্ষার ফল তেমন সুবিধাজনক হ'বে না।

সুভাষচন্দ্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

সুভাষচন্দ্র টেষ্ট দিয়ে মূল পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন এল।

পরীক্ষাও দিলেন ভালই। এত অল্প সময়ে, অতি অল্প পড়েই সুভাষচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়ে সকলকে নিজের প্রতিভায় বিস্মিত করলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ছেলের মধ্যে কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের ছেলে সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করলেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কতকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি তিনি পেলেন। এ হচ্ছে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

এর পর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ. ক্লাশে পড়তে লাগলেন। আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে এবার দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে লাগলেন বি. এ.।

সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সুভাষচন্দ্র পড়েন। খাস বিলেতী অধ্যাপক ই. এফ. ওটেন তাঁর সময়ের একজন অধ্যাপক। বাঙ্গালীদের অসভ্য, জানোয়ারের মতই মনে ক'রে তিনি সেইভাবে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

সে সময় একবার ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে এক সভা হ'ল। সেই ছাত্রসভায় এই ওটেন্ সাহেব এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় বললেন, "ভারতবর্ষের লোক বর্ব্বর। এদের সমাজের ব্যবস্থা অতি জঘন্য, আমরা ইংরেজেরা এসেছি তাদের সভ্য, ভব্য করতে। জানোয়ার তারা—তাদের মানুষ করতে। তাদের উচিত ইংরেজদের কাছে সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা।"

নবাগত সাহেব। এ-সব কি বলছেন উনি—সভার যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেন—আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্য্যাদার এমন বিসদৃশ অপহ্নবে তাঁরা হ'য়ে উঠেছিলেন নিতান্ত চঞ্চল। কয়েকজন ভারতীয় অধ্যাপক মর্ম্মাহত হ'য়ে উঠে গেলেন। ছাত্রদের উত্তেজনার সীমা থাকল না। যৌবনচঞ্চল তাঁরা—টগ্‌বগ্ করছে তাজা রক্ত তাঁদের সারা দেহে, অসহ্য হ'ল তাঁদের নিতান্ত।

কলেজের ছাত্র—সাধারণতঃ একটু উদ্ধত হয়। ছাত্র-মহলের যখন এই উত্তপ্ত ভাব, অপমানিত অধ্যাপক-মহলেও যুগপৎ উপস্থিত হ'ল বিষম আলোচনা,—চলল তর্কাতর্কি, —নিষ্ফল আক্রোশ। সারা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকগণও নিতান্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।

প্রিন্সিপাল এইচ. আর. জেমস সাহেব শুনলেন সব, কিন্তু কোন প্রতিকার করলেন না।

ওটেন্ সাহেব অন্য অধ্যাপকদের মুখে প্রতিবাদ শুনলেন, কিন্তু ত্রুটি স্বীকার করা দূরের কথা, বরং সদম্ভে অধ্যাপকদের মুখের উপরই বললেন—অন্যায় কিছুই বলেননি তিনি।

এর পরও সমভাবে ঔদ্ধত্য চলল তাঁর—ছেলেরা উত্তেজিত হয়েছে শুনে তাঁর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ক্লাসে গেলেন পড়াতে—পড়াতে পড়াতে তিনি সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি ক'রে বসলেন।

কিন্তু যে ক্লাসে তিনি এই সব অসঙ্গত কার্য্য করছিলেন, সে ক্লাসে তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র মহাতেজস্বী, সাহেবের কথা শুনামাত্র সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি।

সুদৃঢ় তাঁর কণ্ঠ—তিনি বললেন—"স্যার্! আমি প্রতিবাদ করছি আপনার কথার। ভারতবর্ষের কলেজে এসে এমন কথা, এমন জঘন্য মিথ্যা কথা,—জাতির পক্ষে অকীর্ত্তিকর কথা বলা আপনার উচিত হয়নি—আমরা ছাত্রেরা এজন্য প্রত্যেকে অপমানিত বোধ করছি।"

সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে তরুণ, তাঁর এ ধৃষ্টতায় সাহেব রেগে জ্বলে উঠলেন—"হোয়াট্ ওয়াজ রং?—অন্যায় তো কিছু বলিনি। অসভ্য ভারতীয়দের, বর্ব্বর ভারতীয়দের সভ্য করেছেন ইংরেজ—তাদের সভ্য করতেই এসেছেন, এ কথা কি মিথ্যা বলতে চাও তুমি?"

সুভাষচন্দ্র সাহেবের হুমকিতে ভয় পাবার ছেলে নন। তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন—"আপনারা ইউরোপীয়েরা যখন পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে পশুর জীবন যাপন করতেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন স্পর্শই পাননি, তখন এই ভারতীয় ঋষিরা সমগ্র পৃথিবীতে সভ্যতার আলোকপাত করেছিলেন।

এ সত্য, অস্বীকার করতে চান আপনি? ইংরেজ শাসক, তাঁদের জাতির লোক, অধ্যাপকের আসনে বসেছেন ব'লে এ সত্যেরও আলাপ করতে চান আপনি? মনে রাখবেন, সে ভারতীয় আর নেই--আত্মসম্মানবোধ জেগেছে তাঁদের অন্তরে, এ জাতীয় অপমান তাঁরা আর নীরবে সহ্য করবেন না।"

কলেজের ক্লাস স্তব্ধ—কি তেজোদৃপ্ত এ উক্তি! কি নির্ভীক এ সহপাঠী তাঁদের।

সুভাষচন্দ্র—বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন ছাত্র-মহলে।

ছাত্র-মহলে প্রবল উত্তেজনা। কাগজে বের হ'তে লাগল এ-সব, দিনের পর দিন। সাহেব প্রত্যেকের অন্তরে আঘাত চালাতে লাগলেন নিত্য নূতন করে। এ যেন অধ্যাপনার একটা অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াল।

ক'দিন পরে একদিন কলেজের টিফিনের ছুটির সময় ওটেন্ সাহেব ক্লাস থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে সিঁড়ি হ'তে পড়ে গেলেন।

কে ফেলল তাঁকে?

সাব্যস্ত হ'ল এ আততায়ী আর কেউ নয়—এ নিশ্চয় সুভাষচন্দ্র। কেউ-ই দেখেনি, শুধু সন্দেহ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে তেমন কোন প্রমাণও হ'ল না— জবানবন্দী দিলেন, সর্ব্বাগ্রে যে অধ্যাপক সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। তিনিও বললেন, সুভাষচন্দ্রকে তিনি দেখেন নি। বাইরের লোকই করেছে। তদন্ত কমিটিও এই সম্ভাবনার উপরই জোর দিলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে রাষ্টিকেট্ করা হ'ল—বিশ্ববিদ্যালয় নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন—আগামী দু'বছর তিনি আর কোন কলেজে পড়তে বা পরীক্ষা দিতে পারবেন না।

এ হচ্ছে আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগেকার—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। স্যার আশুতোষ সব শুনলেন, সব বুঝলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বললে তখন আশুতোষকেই বুঝাত। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনিই ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি দু' দু'বার ক'রে চারবার ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। পঞ্চমবারে ১৯২১ থেকে ১৯২৪ অবধি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ ভাইস্-চ্যান্সেলার হন স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। বোধ হয় তাঁরই আমলে সুভাষচন্দ্রের এ বিচার হয়। ভাইস্-চ্যান্সেলার অন্য হ'লেও স্যার আশুতোষের কর্ত্তৃত্ব সমভাবেই ছিল।

বাংলার বাঘ, এই মহাপুরুষের দৃষ্টি এড়ালেন না সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের অনন্যসাধারণত্ব তিনি সম্যক্ প্রণিধান ক'রে তাঁকে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

সেখান থেকে সুভাষচন্দ্র সম্মানের সহিত দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'লেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এ সময়ে গড়ছিলেন—স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী! সুভাষচন্দ্র নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কর্ত্তব্যাদি সৈনিকের বহু গুণ অর্জ্জন করলেন এই সুযোগে। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের ইউনিফরম্ প'রে তিনি প্রাথমিক সৈন্যের শিক্ষা লাভ করলেন।

অত্যল্প বয়সেই বিদ্যার্থী জীবন আরম্ভ হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স অবধি সুভাষচন্দ্র উড়িষ্যার কটক শহরের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এ ছিল একটি সাহেবী স্কুল।

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে সুভাষচন্দ্র

পিতা জানকীনাথ নিজগুণে কটকের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত লোক হ'য়ে দাঁড়ান। বাঙ্গালী হ'য়েও সব বিষয়েই প্রাধান্য করতে থাকেন সেই উড়িষ্যা দেশে। বাংলা সেখানকার ভাষা নয়—উড়িয়া ভাষা—সুভাষচন্দ্র লালিতপালিত হ'তে লাগলেন সারদা নাম্নী এক উড়েনী পরিচারিকার দ্বারা। এই উড়িষ্যা-বাসিনী সুভাষচন্দ্রকে ডাকতেন "রাজা বাবু" ব'লে—আর সবাই ডাকতেন "সুবি" "সুবি" বলে।

সুভাষের এই সাহেবী স্কুলে পড়বার সময় তাঁর পিতা পোষাক-পরিচ্ছদে অনেকটা সাহেবী ভাবাপন্ন ছিলেন। ছেলেমেয়েরাও পরতেন কোট্, প্যাণ্ট, গাউন, বডিস্ প্রভৃতি। অভিজাত লোকদের এমনই ছিল ধারা সেকালে।

সুভাষচন্দ্র পড়তে যান—যেয়ে দেখেন প্রায় সবাই সাহেবের ছেলে। তিনি বাঙ্গালী—মন তাঁর বিষিয়ে উঠল। সেই শৈশবেই, বাঙ্গালী হ'য়ে সাহেবী পোষাক পরা তিনি ভাল বোধ করলেন না। ধুতি-চাদর পরে র্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হলেন, সাহেবী স্কুল ছেড়ে। কৌতূহলী হ'য়ে একদিন জানকীনাথ বললেন, "কি রে সুবি! তুই এ বেশ পরেছিস্ কেন?"

পুত্র সুভাষচন্দ্র দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর দিলেন রাশভারী পিতার কাছে—

"কেন বাবা? ধুতি-চাদরই তো আমাদের জাতীয় পোষাক, ও স্কুলে যা হোক্, এ স্কুলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও ধুতি-চাদর পরেন। বিজাতীয় বেশ ঐ কোট্, প্যাণ্ট প'রে বাঙ্গালী হ'য়ে খাপ্‌ছাড়া সাহেব সাজব কেন বাবা?" জানকীনাথ পুত্রের কথায় অভিভূত হলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন কটক হ'তে। এই ষোল বছর তিনি উড়িষ্যার কটকে ছিলেন। কটক শহর, শ্রীশ্রীজগন্নাথধাম পুরীর বেশী দূরে নয়। পুরী হিন্দুর এক বিচিত্র তীর্থ। বিগ্রহও অদ্ভুত। কাষ্ঠমূর্ত্তি—হাত, পা নেই—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। জাতির বিচার নেই—সকলেই সকলের হাতে খান—ভাত বিক্রয় হয় বাজারে।

কটক সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলিমা হয় সুপবিত্রা মহানদীর স্বচ্ছ সলিলে।

সুভাষচন্দ্রের শৈশব

সুভাষচন্দ্র শৈশবে স্থির, ধীর গম্ভীর ছিলেন। পড়াশুনার জন্য তাঁকে কোনদিন কিছু বলতে হয়নি।

বালক—অথচ তাঁর নেই কোন উচ্চনীচ জ্ঞান। পীড়িত দেখলে তিনি শুশ্রূষায় মত্ত হতেন। দরিদ্রনারায়ণ সেবায় তাঁর ছিল কতই না আনন্দ!

মা ও ধাইমা শেখাতেন কত কিছু! সাধারণ সব-কিছুর জ্ঞান আহরণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র মা ও ধাইমার সংস্পর্শে।

বাঙ্গালীর ছেলে—বাঙ্গালীর পুণ্য গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত। সেই সব গ্রন্থের আদর্শ পুরুষদের কথা, ঐতিহাসিক মহাজন ও বড় বড় লোকদের জীবনী, বীরত্ব-কাহিনী মুখে মুখেই শুনে শিখে ফেলেছিলেন সুভাষচন্দ্র সেই সুকুমার শৈশবে।

তাঁর পাঁচ বছর বয়সের হাতেখড়ির গল্প প্রবাদের মত। হাতেখড়ি দিয়েছিলেন পুরোহিত ঠাকুর। সুভাষ অতটুকু ছেলে, ঝর্ ঝর্ ক'রে লিখে গেলেন অ, আ, ক, খ—অনেক কিছু খড়িমাটি দিয়ে। পাথরের থালা ভ'রে লিখে দিলেন। পুরোহিত ঠাকুর সবিস্ময়ে বললেন—"একে কি হাতেখড়ি দেব? কেমন ক'রে আগেই এ যে শিখে ফেলেছে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ; অবাধ গতি হবে ওঁর মা সরস্বতীর মন্দিরে।"

সুভাষচন্দ্রের শৈশবের সাধারণ জ্ঞান অনেকের পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু। এ-সব মহাজন—মহাপুরুষের লক্ষণ।

সংসারে নেই অভাব, নেই আদর-যত্নের কোন ত্রুটি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়—এর অল্প পরেই আসে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট বৎসর। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এই সালেই বঙ্গভঙ্গের প্রলয় আগুন লাগিয়ে দেন সারা দেশে। এ সময়ে সুভাষচন্দ্রের বয়স আট বছর, শিশু শ্রেণীর ছাত্র তিনি।

তৃতীয় অধ্যায়

যুগাধিনেতা সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব

"নূতন সূর্য্য জাগিবে আবার, প্রভাত সুদূর নয়।
নূতন তীরের নবতম সঞ্চয় ;
তামসী রাত্রে বিদ্যুতালোকে জাগে মৃত্যুঞ্জয়।

* * * *

নূতন সূর্য্য সম্ভাবনায় রঙ্গীন পূর্ব্বাচল,
হে নাবিক, তুমি হারায়ো না পথ, হারায়ো না মনোবল।"

যুগে যুগে আসেন তিনি। নিজ মুখে তিনি বলেছিলেন—"ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে—ব্যভিচার, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার দেখা দিলে—সেই সব দূর করবার জন্য সময়োপযোগী মূর্ত্তি নিয়ে আসি আমি সৃষ্টিকর্ত্তা।" তিনিই এ-সব সৃষ্টি করেন, তিনিই এ-সব ভাঙ্গেন। গড়া আর ভাঙ্গা তাঁরই নিত্য লীলা। লীলাময় তিনি, ইচ্ছাময় তিনি, সর্ব্ব-শক্তিমান্ তিনি।

সুপ্রাচীনা এই ভারতভূমি—সুচিরকালস্থায়ী এর পরাধীনতা।

হাসছিলেন নিয়তি—

বীর সন্তানেরা, বীরাঙ্গনারা এঁর করছিলেন জীবন-পণে কতই না সংগ্রাম! কিন্তু সময় না এলে ফুল ফোটে না, কোকিল ডাকে না—মঞ্জুরিত হয় না ফুল, পরিপক্ক হয় না ফল, অরুণায়িত হয় না ধরণী। নিয়মিত এ বিশ্বের সব-কিছু।

বিশ্ববরেণ্য হ'য়ে আবির্ভূত হলেন ভারতের এ যুগের যুগাধিনেতা।

.এদেশেরই রাজপুত-সিংহ প্রতাপসিংহও এক সময়ে বনে শিশুদের খাদ্যাভাবে শত্রুর নিকট সন্ধির প্রস্তাবের দৈন্য স্বীকার করেছিলেন—কিন্তু এই যে যুগাধিনেতার আবির্ভাব হ'ল, এ যুগাধিনেতা—বঙ্গের এ মহাবীর সন্তান—কোনদিন কোন আপোষ, কোন মীমাংসা—কোন "রফা"র প্রস্তাবে সম্মত হননি। আঁকাবাঁকা পথে মাথা নোয়াবার লোক নন তিনি।

রাজপুতের রাজ্য ছেড়ে যদি চেয়ে দেখি—আমরা দেখি মহারাষ্ট্র দেশে রাষ্ট্রপতি ছত্রপতি হ'য়ে এসেছিলেন একদিন পর্ব্বতমূষিক, চতুরচূড়ামণি শিবাজী মহারাজ।

আলমগীর ছিলেন অতি ধূর্ত্ত; সেই আলমগীর বাদশাহকে কৌশলে প্রতারিত ক'রে শিবাজী পলায়ন করেছিলেন সত্য; কিন্তু মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ আর তাঁদের ধূর্ত্ততম পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার কৃতিত্ব তার চেয়েও যে অনেক—অনেক অধিক! মহারাষ্ট্রপতির পশ্চাতে ছিল তাঁর সুশিক্ষিত বিপুল বাহিনী, সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ, সঙ্গে ছিল তাঁর—আজীবন সহচর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগকালে তাঁর কি এবং কে ছিল সহায়? প্রায় এক বস্ত্রে আত্মরক্ষার উপায়হীন অবস্থায় একমাত্র অদম্য সাহস ও দেশমাতৃকার প্রতি অনন্য ভক্তি মাত্র সম্বল ক'রে তিনি বিশ্ব-সমরাঙ্গনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বের বিস্ময় তিনি!

মনে পড়ে—"মহাজাতি সদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিন তিনি দেশবাসীকে আকুলভাবে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—

"আসুন, জয় মা বলে ঝাঁপ দিই জাতির মুক্তি-সংগ্রামে।"

এ শুধু যুগাধিনেতার মুখের কথা ছিল না। একে তিনি বক্তৃতায় পর্য্যবসিত বা পরিসমাপ্ত হ'তে দেননি।

প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁর আত্মত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন—বৃহত্তর ভারতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর স্মরণীয় ও বরণীয় কীর্ত্তি-কলাপ হ'তে আরম্ভ ক'রে ভারতের বিভিন্নাংশে অগণিত বালক ও কিশোর বীরগণের অকুণ্ঠিত মৃত্যুবরণ অবধি তাঁর যাবতীয় অবদানাবলী।

দেশমাতৃকার যতটুকু অধীনতা-শৃঙ্খল খসে পড়েছে, তার অধিকাংশের মুল যে তাঁরই অতুলনীয় সাধনা—বিবেচক মাত্রেই অবশ্য তা স্বীকার করবেন। তাঁরই বাণীর, তাঁরই নির্দ্দেশের প্রকারান্তর করেছেন—অপরাপর নেতৃবৃন্দ। বাঙ্গালী তিনি, এই ছিল তাঁর মস্তবড় অপরাধ—অথচ চিরদিন বাঙ্গালীই যুগাধিনেতা। ভারতের ইতিহাসে ইএ যুগাধিনেতার তুলনা তো নেই-ই, বিশ্বের ইতিহাসেও কোথাও বোধ হয় পাওয়া যায় না। তাঁর নূতন নূতন অবদান, কাহিনীর ন্যায় ভেসে আসছে দিন দিন। সে-সব কতই না রোমাঞ্চকর।

যুগাধিনেতা সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালী হ'য়েও আবির্ভূত হয়েছিলেন উড়িষ্যার প্রধান শহর কটকে। কটক তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস নয়।

তাঁর পিতা ছিলেন কটকপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের অন্যতম। কটক ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল। পিতৃবংশের পূর্ব্ব অধিবাসভূমি ছিল পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রাম। সে গ্রাম এখনও আছে।

কলকাতার শিয়ালদহ রেলওয়ে জংসনের দক্ষিণ বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে ডায়মণ্ড হারবার বা লক্ষ্মীকান্তপুর যাবার ট্রেণে চেপে চিংড়িপোতা বা মল্লিকপুর ষ্টেশনে নামলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কোদালিয়ায় উপস্থিত হওয়া যায়! কোদালিয়া কলকাতা হ'তে মাত্র ১২।১৩ মাইল দক্ষিণে।

এক সময়ে এ গ্রাম নানাভাবে সুসমৃদ্ধ ছিল। কালব্যাধি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে উহা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই কোদালিয়ার কায়স্থ বসুবংশ চিরপ্রসিদ্ধ। এই বসুবংশের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার মাইনগর গ্রাম। এইজন্যই আমাদের যুগাধিনেতা সুভাষচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ "মাইনগরের বসু" ব'লে কায়স্থ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মাইনগরের এই বসুবংশ কায়স্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন। এক সময়ে এঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যিসত্যিই কুলীনের নবগুণে ভূষিত ছিলেন।

"আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানো নবধা কুললক্ষণং।"

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান—এ-সব গুণের একত্র সমন্বয় হয়েছিল এঁদের মহিমময় পূর্ব্বপুরুষদের চরিত্রে!

চতুর্থ অধ্যায়

মাতাপিতা ও অভিভাবকবর্গ

"—সে জীবন,
সে বেদন,
সার্থক—অপরূপ।"

দিলীপকুমারের—"আমার বন্ধু সুভাষ"

নেতাজীর পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু মহাশয়, মাতা স্বর্গীয়া প্রভাবতী বসু-জায়া নেতাজীর জন্মসময়ে দু' মেয়ে ও পাঁচ ছেলের জনক-জননী ছিলেন।

জানকীনাথ কৃতবিদ্য—উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালী, বিশেষভাবে সকলের পরিচিত। উড়িষ্যার প্রধান অপ্রধান, বহু লোক তাঁর মক্কেল এবং তাঁর জানাশুনা।

সাধারণ ওকালতী থেকে নিজ গুণে তিনি সরকারী উকীল হয়েছিলেন।

কটক শহর নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। জানকীনাথ সেই শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন। তাঁর মত নাম-করা, মাননীয়, কৃতী পুরুষ সে যুগের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিরল। ওকালতীর পূর্ব্বে, চব্বিশ পরগণার সদর মহকুমার জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলের "জয়নগর ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামক নাম-করা হাই স্কুলে তিনি হেড

মাষ্টারী করতেন। পঠদ্দশা থেকেই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি গণ্যমান্য হবেন এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অসাধারণ পরিশ্রমী, অসামান্য আত্মবিশ্বাসী এবং উদেযাগী পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর কর্ম্মশক্তি, তাঁর প্রতিভা শুধু ওকালতীতেই বদ্ধ রইল না,—নিজের স্বার্থের অপেক্ষা পরার্থের নিমিত্ত তিনি সচেষ্ট হলেন। স্থানীয় বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, দেশের মঙ্গলজনক বহু কর্ম্মের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচনা করলেন। জেলা বোর্ডের হলেন কর্ণধার। সরকারী উকীল হ'য়ে মুগ্ধ করলেন সরকারকে। তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হ'য়ে বৃটিশ সরকারের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে অলঙ্কৃত করলেন।

অতি তেজস্বী পুরুষ তিনি—সরকারী ধামা ধরেননি জীবনে কোনদিন। কিন্তু তাঁর অসামান্য আইন-জ্ঞানে মুগ্ধ হ'য়ে সরকার তাঁকে তার পক্ষ সমর্থক বলে নির্ব্বাচন করেন। সরকারী প্রীতির কোন মোহ ছিল না তাঁর। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি সরকারের দমন-নীতির অবৈধতার প্রতিবাদে সরকারী খেতাব বর্জ্জন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

প্রিয় পুত্র সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড হ'ল—সংবাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্র জানকীনাথ ব'লে উঠলেন—অবিচলিত, দৃপ্ত তাঁর স্বর—"আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি, সুভাষের জন্য।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তিনি, দুঃখে কষ্টে মানুষ হয়েছিলেন, কাজেই অপরের দুঃখকষ্ট তিনি সম্যক বুঝতে পারতেন।

পুত্রগণ তাঁর অসাধারণত্বে অসাধারণ হ'য়ে উঠেছিলেন। যে পিতা পুত্রের আই. সি. এস. পদে ইস্তফা দেওয়ায় বলতে পারেন "আমি সত্যি খুশী হয়েছি। আমার স্ত্রী আরও খুশী হয়েছেন।" —তাঁদের সন্তানগণ যে দেশাত্মবোধে, অন্তরের পরিচয়ে সর্ব্বপ্রাধান্য লাভ করবেন, তাতে আশ্চর্য্য কি? গুরু গম্ভীর পিতার গুরু গম্ভীর পুত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র। হাল্কা বিষয়ে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না কোনদিন। জানকীনাথ নিজে বিদ্বান ছিলেন, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, পুত্রগণকেও অনুরূপ-ভাবে সুশিক্ষিত করতে প্রয়াসী হন। উপার্জ্জিত বিপুল অর্থে পুত্রগণকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলেন। পুত্রগণের প্রত্যেককে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিল্প, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আধুনিক জগতে মানুষ হ'য়ে না দাঁড়ালে নিজেদের ও দেশের উন্নতি যে সুদূরপরাহত—এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা।

এই সমস্ত আগ্রহের জন্য এমন সুসন্তান, দেশমাতৃকার এমন একনিষ্ঠ সেবক, এমন অলোকসামান্য ত্যাগী, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন সুভাষচন্দ্রকে তিনি পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। এরূপ প্রাতঃস্মরণীয়—এরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান, অলৌকিক স্বার্থত্যাগী, অভূতপূর্ব্ব তেজস্বী, আশ্চর্য্য সংগঠন শক্তিশালী, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক পুত্রলাভ সহজ সাধনা বা পুণ্যফলে ঘটেনি।

ছত্রপতি শিবাজী, রাণা প্রতাপ প্রমুখ মহাবীর, মহা-পুরুষগণের কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি। ভীষ্মের

সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের কথা আমরা মহাভারতে পাঠ ক'রে বিস্মিত হই। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আচরিত অবদানাবলীতে এই যুগে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে—সম্ভব ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি পূর্ব্ববর্ত্তীদের অসম্ভব গুণগ্রাম। যে সকল প্রত্যক্ষ না হওয়ায় বিশ্বাস করতে ছিল ইতস্ততঃ সে সকল প্রত্যক্ষীভূত ক'রে, বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলেছিলেন নেতাজী তাঁর অত্যদ্ভুত কর্ম্ম-পরম্পরায়।

পরাধীনতার এমন পঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও একটি বাঙ্গালীর ছেলে যে নবীন জ্যোতিষ্কের ন্যায় স্বীয় বিমল দ্যুতিতে সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত—হিমালয় হ'তে কুমারিকা অবধি বিদীর্ণ ক'রে,—পাশ্চাত্ত্যের অহমিকাময় ইংরেজগণকে সন্ত্রস্ত ও ভীতিবিহ্বল করতে পারে, এ ধারণা সুভাষচন্দ্রের কার্য্যাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করত,—কে সম্ভবপর ব'লে ভাবত ?

অসঙ্ঘবদ্ধ বঙ্গ সমাজে—একতাহীন ভারতবর্ষে নেতাজীর আবির্ভাব হয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধতা ও একতা সংস্থাপনের নিমিত্ত। সুভাষচন্দ্র শৈশবাবধি গড়তে সুরু করেন "দল"। দল গড়ে, শহরের কলেরা-আক্রান্ত অঞ্চলের লোকের শুশ্রূষা ও সেবা করতে থাকেন। বারোয়ারী দুর্গোৎসব করিয়ে একতার—সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি করেন। বহু সৎকর্ম্মের নায়ক হ'য়ে উঠেন বাল্যকাল থেকেই।

কীর্ত্তনের দল ও লাইব্রেরী ক'রে সকলকে ভগবান রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে উৎসাহ দান—নৈশ বিদ্যালয়

গড়ে সাধারণের বিদ্যালাভের সুযোগ ক'রে দেওয়া প্রভৃতি ছিল বালক সুভাষচন্দ্রের কর্ম্ম। তাঁর বয়সে তাঁর মত ধনীর দুলাল নানা অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তাঁর একটিমাত্র অপকর্ম্মের কথাও শোনা যায়নি।

কয় জন ছেলে বলতে পারে সুভাষচন্দ্রের পিতার মত রাশভারী লোকের সামনে দাঁড়িয়ে—

"জানি আমি বাবা, এ রোগ সংক্রামক, জেনে সাবধানেই যাই শুশ্রূষা করতে। ফিরে এসে ভাল ক'রে স্নান করি—কাপড়-চোপড় ধুই। যে ছেলেটিকে শুশ্রূষা করি, তার যে কেউ নেই এখানে, আমরা না গেলে শুশ্রূষার অভাবে সে মরে যাবে।"

মাতা প্রভাবতী দেবী সেকালের মেয়েদের মত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। অথচ অত্যন্ত আধুনিকতায়ও কোন দোষ দেখতেন না। কেমন মা হ'লে এমন ছেলে হয় তা বোধ হয় বিশেষ ক'রে না বললেও চলবে।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, মাসী, পিসী, বন্ধু প্রভৃতির প্রভাব, সংস্পর্শ ও শিক্ষাতেই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে উঠে।

বড় ভাইরা সব বিচিত্র চরিত্রে চরিত্রবান। আধুনিক বাংলার স্বনামধন্য নেতা শরৎচন্দ্রের স্ত্রী নেতাজীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। শিক্ষক ছিলেন তাঁর স্বর্গীয় বেণীমাধব দাস মহাশয়ের মত লোক—সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার যাঁর তুলনা ছিল

না। অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারের ইঙ্গিতে সুভাষচন্দ্র সেবা দল সংগঠন আরম্ভ করেন।

পাঠ্য গ্রন্থ ছিল পরমহংসদেবের কথামৃত, বিবেকানন্দজীর গ্রন্থাবলী প্রভৃতি। ধাত্রী মাতা সারদা ছিলেন সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। সর্ব্বাধিক সুযোগ ঘটেছিল সময়ক্রমে।

সুভাষচন্দ্রের কৈশোর কালেই দেশে জেগে উঠে স্বদেশী আন্দোলন। নব জাগরণ সমারম্ভ হয়েছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশ তোলপাড় হচ্ছে। ছাত্র-সমাজে প্রবল তরঙ্গ—দেশময় আলোড়ন।

'বন্দে মাতরম' মহামন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের কথা, শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব, বিবেকানন্দজীর সেবা ও সংগঠন।

এদিকে বন্ধু হেমন্তকুমার, বন্ধু দিলীপকুমার প্রভৃতির সু-সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের মহতোমহীয়ান জীবন।

তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের প্রতিবিম্ব যেন—প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর বাল্যকালেই।

কৈশোর, যৌবন—সমভাবে ক'রে তুলেছিল সুসমৃদ্ধ। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। শুধু দেশের স্বাধীনতা লাভই নয়—দেশের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ-নৈতিক উন্নতি, শিক্ষা সম্প্রসারণের চেষ্টায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

শুধু দর্শনশাস্ত্রের কথা যদি তিনি বলতেন, হয়তো তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা নূতনত্বে ভ'রে উঠত।

পাশ্চাত্ত্য—সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, ক্যান্ট, হেগেল, দেশীয়—শঙ্কর, রামানুজের প্রতিষ্ঠা হয়তো তিনি লাভ করতে পারতেন।

কিন্তু স্বাধীনতার সাধনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদানাবলী জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করল।

লোকোত্তর তাঁর চরিত্র। তিনি জীবনে ধন, জন, সংসার-সুখ প্রভৃতি কিছুই চাননি—ব্রহ্মচারী অকলঙ্ক চরিত্র এই মহান নেতা। ঐহিক সর্ব্ব সুখ-সম্পদ, মান-সম্মানের অধিকারী সুভাষচন্দ্র একদিন মাকে লিখলেন—

"মা, আপনার মতে আমাদের এ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুই বেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র-পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেছেন—দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন, শিক্ষাপ্রদানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি, এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ছাত্র-জীবনের শেষে আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রবেশ করিয়া সারা জীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিভাগে দেখিলে আপনি সর্ব্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনের

ইচ্ছা কি? মা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে? কি ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে? প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাস-দাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণীজনের দ্বারা প্রকৃত মানুষ বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে, তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্ব্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।"

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শৃঙ্খলাপ্রিয়, স্বার্থত্যাগী হ'তে হ'বে। তবেই প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি।

——

মহাশক্তি সঞ্চারক নেতাজীর মহাবাণী-নিচয়

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

যাঁরা নেতাজীর বাণীগুলির মর্ম্ম গ্রহণ ও পাঠ ক'রে পুলকিত হ'তে চান, তাঁরা—নেতাজীর বহু বক্তৃতা ও পত্রের সঙ্কলন—'Dreams of a youth', বা 'In quest of the new', বা তাদের অনুবাদ 'তরুণের স্বপ্ন', 'নূতনের সন্ধান' পড়বেন। তা'ছাড়া তাঁর 'মা ও মেয়েদের প্রতি'—'Indian Struggle', 'Swadeshi and Boycott' প্রভৃতি পড়বেন।

আমরা তাঁর পত্রাদি ও বক্তৃতা থেকে কয়েকটি নিম্নে দিলাম :—

৫ই মে, ১৯৪২, বার্লিন হইতে—

বৃটিশ প্রচার বিভাগ বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যাহাই বলুক, সুচিন্তাপরায়ণ সকল ভারতবাসীর ইহা স্পষ্ট জানা উচিত যে, এই বিপুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একমাত্র শত্রু—যে শত্রু শতাধিক বর্ষকাল তাহাকে শোষণ করিয়াছে—যে শত্রু ভারতমাতার জীবন-শোণিত চুষিয়া লইতেছে—সে শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেদিন পরাভূত হইবে, সেইদিনই ভারত স্বাধীন হইবে। এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

অবিচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রামেই আমার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে। আমি শৈশব হইতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিনিয়াছি। কূটনীতিতে ওস্তাদ তাহারা, কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিতে পারে নাই। পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাহা পারিবে না।

আমি আজীবন ভারতবর্ষের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি থাকি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও ভক্তি আজিকার মত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। স্বদেশীয় বন্ধুগণ! ভারতবর্ষের আসন্ন মুক্তির মুখে আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শেষ স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

২১শে জুন, ১৯৪৩, টোকিও হইতে—

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন আপোষের আশা আমাদিগকে একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের স্বাধীনতা আপোষের অপেক্ষা রাখে না। বৃটিশ ও তাহার মিত্রশক্তিরা যখন চিরতরে ভারত পরিত্যাগ করিবে তখনই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে। যাহারা সত্যই স্বাধীনতা চায়, তাহাদিগকে তাহার জন্য সংগ্রাম বরণ করিয়া লইতে হইবে এবং বক্ষ-রক্ত মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে হইবে। * * * * অচিরকাল মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কারাগারের উন্মুক্ত দ্বারপথে তাঁহার মহৎ সন্তানেরা একে

একে অন্ধকার-বন্ধন-কোটর হইতে স্বাধীনতার আলোকে উত্তীর্ণ হইবেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার দায়িত্ব আমাদের ভারতবাসীরই শুধু। সে দায়িত্ব আমরা অন্য কোন জাতির উপর চাপাইয়া দিব না, কারণ তাহা হইলে আমাদের জাতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। * * * * বৃটিশ শক্তিকে যদি আমরা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে চাই, তাহাদের সহিত লড়িতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুদূর প্রাচ্য এশিয়ায় অবস্থিত আমার স্বদেশবাসীদের সাহায্যে আমি এমন বিরাট সৈন্যদল গঠন করিতে পারিব, ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শক্তিকে যাহারা নিঃশেষে বিদায় করিতে পারিবে।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩, সিঙ্গাপুর হইতে—

আজ আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন, আজ বিধাতা সদয় হইয়া আমাকে অদ্বিতীয় সম্মানে ভূষিত করিলেন। আমি সমস্ত জগতের কাছে ভারতের মুক্তি-ফৌজের অস্তিত্বের কথা নিবেদন করিয়া গৌরব লাভ করিলাম। সিঙ্গাপুরের সমরক্ষেত্রে এই ফৌজ আজ সামরিক শ্রেণীবদ্ধতায় সজ্জিত হইয়াছে। সেই সিঙ্গাপুর,—যাহা একদা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এই ফৌজ বৃটিশের বন্ধন-জোয়াল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবে। সমস্ত ভারতবাসীর ইহা গর্ব্বের বিষয় যে, এই ভারতীয় ফৌজ সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়াছে এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত যখন আসিবে, ভারতীয় নেতৃত্বেই ইহা সমরাভিযান করিবে। বন্ধুগণ, আমার সৈন্যগণ, "দিল্লী চলো", "দিল্লী চলো" ইহাই তোমাদের

যুদ্ধধ্বনি হউক। আমি জানি না, এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে তোমরা কয়জন বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে, শেষ পর্য্যন্ত আমরা জয়লাভ করিবই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের মৃতাবশিষ্ট বীরেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম সমাধিক্ষেত্র প্রাচীন দিল্লীর লালকেল্লায় সশস্ত্র শোভাযাত্রা করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। তোমরাই প্রথম সুযোগ লাভ করিয়াছ। প্রথম গৌরব তোমাদেরই যে, তোমরা পুরোভাগে আসিয়া ভারতের প্রথম মুক্তি-সেনা গঠন করিয়াছ।

বন্ধুগণ! তোমরাই আজ ভারতের জাতীয় গৌরবের রক্ষক। ভারতবর্ষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার তোমরাই আজ মূর্ত্ত প্রতীক। তোমরা সেইভাবে চল, দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ যাহাতে তোমাদের স্মরণে গৌরবান্বিত হয়। আমার এই কথা তোমরা বিশ্বাস কর যে, অন্ধকারে এবং রৌদ্রালোকে, দুঃখে এবং সুখে, চরমতম দুর্দ্দশায় এবং বিজয়ের আনন্দে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব। আপাততঃ তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, সুদীর্ঘ পথ এবং মৃত্যু ছাড়া আমার কিছুই দিবার নাই। আমাদের মধ্যে কে বাঁচিয়া থাকিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিবে, তাহার বিচার আজ নয়। এইটুকু আশ্বাসই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই। এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য আমরা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব। আমাদের ফৌজ ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করুক্। আগামী যুদ্ধে আমরা যেন বিজয়ী হই।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৩, সিঙ্গাপুর—

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কল্যাণে আমি অদ্য হইতে আমাদের সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করিলাম। আমার পক্ষে ইহা আনন্দের ও গর্ব্বের বিষয়। কারণ ভারতীয় মুক্তি-ফৌজের অধিনায়ক হওয়া অপেক্ষা কোন্ সম্মান ভারতবাসীর অধিকতর কাম্য হইতে পারে? আমার স্বদেশবাসী আটত্রিশ কোটি লোকের সেবক বলিয়া আমি নিজেকে মনে করি। আমি আমার কর্ত্তব্য সেইভাবে পালন করিতে চাই, যাহাতে এই আটত্রিশ কোটি লোকের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩—

ভারতের স্বাধীনতা আজ অতি নিকটে। এখন প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য হইল একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া তাহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। কিন্তু ভারতের নেতারা আজ কারাগারের অন্তরালে এবং জনসাধারণও নিরস্ত্র। এইরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া তাহার অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করা অসম্ভব। তাই পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতে মনস্থ করিয়াছে।

এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ভারতভূমি হইতে বৃটিশ ও তাহাদের মিত্রদের বিতাড়িত করিবার জন্য লড়িতে থাকিবে। তাহার পর এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে একটি বিশ্বাসভাজন স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবে। যতদিন না স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে ততদিন এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টই দেশ শাসন করিবে। ভগবানের নামে অতীতে অনেকে ভারতীয় জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া বহু বীর পুরুষও এদেশে বীরত্ব ও ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের পবিত্র নামে ভারতীয় জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য আমরা তাহাদিগকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। শত্রুকে যতদিন না ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনিতে সমর্থ হইতেছি, ততদিন পর্য্যন্ত চরম জয়ে আস্থা রাখিয়া আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩—

'ঝাঁসির রাণী বাহিনী'র শিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতি-পথে ইহা একটি স্মরণীয় কাহিনী। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক নয়। আমরা আমাদের দেশের পুনর্জীবনের মহান্ কার্য্যে অবতীর্ণ

হইয়াছি। আমরা ভারতের জন্য এক নবযুগ আনয়ন করিতেছি। কাজেই আমাদের নতুন জীবনের ভিত্তি হইবে সুদৃঢ়। স্মরণ রাখুন যে, ইহা ঢক্কা-নিনাদ নয়। আমরা ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন দেখিতেছি। এই নব জাগরণ ভারতীয় নারীদের মধ্যেও স্বাভাবিক।

আজ যে শিক্ষা-শিবিরের উদ্বোধন করা হইতেছে, তাহাতে আমাদের ১৫৬ জন ভগ্নী শিক্ষা লাভ করিতেছেন। আমি আশা করি, শোনানে তাঁহাদের সংখ্যা শীঘ্রই এক হাজার হইবে। থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশেও নারী-শিক্ষা শিবির স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু শোনানে হইতেছে কেন্দ্রীয় শিবির। আমার বিশ্বাস, এই কেন্দ্রীয় শিবিরে এক হাজার "ঝাঁসীর রাণী" প্রস্তুত হইবে।

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৪৪—

** "দূরে, বহুদূরে ঐ নদনদী ছাড়াইয়া, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড়-পর্ব্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ— ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোন! ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে। আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে— আত্মীয়রা আত্মীয়দের ডাকিতেছে। ওঠ, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র হাতে লও, দেখ, তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথ-প্রদর্শকগণ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর

হইব। শত্রু-সেনার ম ' দিয়া আমাদের পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৫—

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি—

আজ গভীর বেদনার সহিত আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, যেখানে আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন ও এখনও চালাইতেছেন। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু ইহা প্রথম চেষ্টা মাত্র। আরও অনেক চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। চিরদিন আমি আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইতে রাজী নই। ইম্ফলের সমতল ভূ-খণ্ডে, আরাকানের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশে ও অন্যান্য অংশে আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনাদের বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে।

ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ্—

সুভাষচন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক

নেতাজীর একখানি পত্র

[বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়কে লিখিত]

৩৮।২, এল্‌গিন্ রোড্, কলিকাতা

১৯।৬।১৯১৪

প্রিয় হেমন্ত,

ট্রাম হইতে নামিয়া বুক টান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। মামা ও একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরের ঘরে দেখা হইল। তাঁহারা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মার কাছে খবর গেল, অর্দ্ধেক পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—আমার মৃত্যুর জন্যই তোমার জন্ম। বাবার সঙ্গে দেখা। প্রণামান্তে তিনি ত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বাবাও অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি শুইয়া পড়িলেন। আমি ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দু'জনেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্তই খুলিয়া বলিলাম। কেবল বলিলেন, একখানা চিঠি দাও নাই কেন?

নানাস্থানে টেলিগ্রাফ ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা পাগল-প্রায় হওয়াতে অগত্যা মামা গিয়াছিলেন আমার অনুসন্ধানে বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে। সব পাহাড়ে খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পৌছিয়াছে। তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। স্বামী বালানন্দের কাছে

গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে, তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড়ে খোঁজ হইয়াছিল। হরিদ্বার রামকৃষ্ণ মিশনে তার করা হইয়াছিল। হাওড়ার একজন জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া আসিবে এক মাসের ভিতর। ভাল আছে। একলা নাই। উত্তর-পশ্চিমে 'ব' দিয়া নামের আরম্ভ এরূপ কোন স্থানে আছে।" কি আশ্চর্য্য রকম মিলিয়া গিয়াছে দেখ। তখন তুমি আর আমি বারাণসীতে। জ্যোতিষ যে একটা মস্ত বড় বিজ্ঞান এখন বুঝিতে পারিতেছি। এইবার জ্যোতিষের বই পড়িতে আরম্ভ করিব ভাবিতেছি। তবে বড় শক্ত জিনিষ। আমার খুব বিশ্বাস আছে। তিনি আরও বলেছিলেন, Contrary Influence-এর জন্য সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না।

দুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়, নানা মত লইয়া। সন্ন্যাসী ও দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম, কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার আদর্শটিও বলিলাম। সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন: (১) সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় কি না। (২) ত্যাগের জন্য Preparation দরকার। (৩) কর্ত্তব্য ত্যাগটা অনেকটা নির্ভর করে, সকলের জন্য বেশী ঘষা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে। কর্ত্তব্যটা Relative. Higher call আসিলে Lower calls ভাসিয়া যায়—জ্ঞান আসিলে কর্ম্ম নাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্বৈত জ্ঞান—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—একটা Theory কি না—বলিলাম, যতক্ষণ মুখে বলছি, ততক্ষণ Theory. কিন্তু Realise করিলে সত্য এবং Realise করা যায়। যাঁহারা একথা

বলিয়াছেন, তাঁহারা Realise করিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছেন আমরাও Realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহারা করিয়াছিলেন এবং প্রমাণ কি?" বলিলাম—"ঋষিরা করিয়াছিলেন। প্রমাণ—"বেদাহং মেতম্ পুরুষঃ মহান্তং" ইত্যাদি। আমি বলিলাম—"বিবেকানন্দের আদর্শই আমার আদর্শ।" শেষে বলিলেন—"আচ্ছা যখন তোমার Higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব।"

Next Timeএ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে বাবা বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন। মা বলিলেন, "আমার সুবি যদি চলিয়া যায়, আমি থাকিব না।" তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব Reasonable. যাহা হউক বাড়ী ফিরিয়া আসাতে ভালই হইয়াছে এখন দেখিতেছি। ইতি।

তোমার

'সুভাষ'

নেতাজীর কয়েকটি অমূল্য উপদেশ

আজ বাংলার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে তত বেশী।

আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিতে পারে, এরকম একজন লোকও কি আজ সারা বাংলার মধ্যে পাওয়া যায় না?

পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাই।

যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে।

জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না।

তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবু সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইতে পারিলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না।

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবা করিয়া যাও।

ভিতরের সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না।

যে মানুষ যাহা চিন্তা করে সে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। যে নিজেকে "দুর্ব্বল পাপী" ভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভয় জয় করার উপায় শক্তি-সাধনা। রক্ত দাও, স্বাধীনতা এনে দেবো।

পূজার উদ্দেশ্য মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। * * পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। বলির অর্থ—রিপুবলি—ছাগ কামের রূপ।

প্রত্যহ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শক্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

মহাপুরুষদের জীবনী বিশ্লেষণ কর—দেখিবে তাহাতে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম।

জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষা দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব, সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে, সেখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

বীরের মত অগ্রসর হইবে—আমার ক্ষুদ্র জীবনে যদি শক্তি কিছু সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

মনে রাখিবে, আমাদের সমবেত চেষ্টায় আমাদের ভারতবর্ষে নতুন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়াছে। আমাদের ব্যবসায়, আমাদের বাণিজ্য, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, শিল্পকলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এই সুধা আহরণ করিয়া আনিবে কে ?—তোমরাই।

স্বাধীনতাই জীবন—স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে আছে—অবিনশ্বর গৌরব।

ছাত্র-জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জ্জন করা। দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে।
